ভিক্টর হুগো

ফাঁসির আগের দিন

অনুবাদ :

হরিরঞ্জন দাশ গুপ্ত

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

ভূমিকা

যে সব সাহিত্যিক দেশ ও কালের সীমা উলঙ্ঘন করে সর্ব-দেশের ও সর্ব-কালের অমরত্বে চির-প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, ভিক্‌টর হুগো সেই অমর অবিস্মরণীয়দেরই একজন। তাঁর রচনার মধ্যে একজন ফরাসী যে-আনন্দ আর যে-অনুভূতির স্পন্দন উপভোগ করে, আমরা বাঙালীরাও ঠিক সেই আনন্দ আর সেই অনুভূতির স্বাদ পাই। পঞ্চাশ বছর আগে, তাঁর রচনা যে-রকম সত্য আর জীবন্ত ছিল, পঞ্চাশ বছর পরে আজও তা তেমনি সত্য আর তেমনি জীবন্ত হয়ে আছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁদের রচনার প্রভাবের কোন তারতম্য ঘটে না। কালজয়ী তাঁরা।

হুগোর সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ভারত-মনের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। তাঁর প্রত্যেক রচনার মধ্যে যে বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, যে অত্যুজ্জ্বল মানব-ধর্ম, সংগ্রাম-শীল মানব-মনের যে অসীম বীরত্ব আর শৌর্যের অনির্বাণ অগ্নি-শিখা জ্বলছে, তার

সঙ্গে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের আর্য-ঋষিরা যে ভূমার আদর্শকে প্রচার করে গিয়েছেন, ভিক্টর হুগো তাঁর বিরাট সাহিত্যে সেই ভূমাকেই জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর রচনা তাই ক্ষুদ্রতার, সীমাবদ্ধতার, তুচ্ছতার রুদ্র প্রতিবাদ। তাই তাঁর সমস্ত কাহিনীর পটভূমিকা হ'লো আকাশের মতন সুবিস্তৃত, সমুদ্রের মতন সুগভীর, অনাদি জীবনের মতনই সুবিশাল। সেই সুবিশাল পটভূমিকায় তিনি যে সব মানব-মানবীদের সৃষ্টি করেছেন, তারাও সেই পটভূমিকার অনুরূপ অতিকায়, বিরাট, দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সাহিত্যের প্রতি ছত্র থেকে স্পর্শ পাওয়া যায় সুবিপুল প্রাণের মৃত্যু-জয়ী উত্তাপের, তাঁর সাহিত্যের প্রতি ছত্র থেকে কানে এসে বাজে বিশালতার আহ্বান, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে অসীমের অঙ্গ-লীন হবার আমন্ত্রণ।

একজন বিখ্যাত সমালোচক এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "হুগোর নভেল পড়ে যখন রাস্তায় পা দিই, তখন মনে হয়, আমার চারদিকে যে-সব মানুষ চলাফেরা করছে, তাদের চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গিয়েছে, মনে হয় তাদের মাথা যেন পাহাড়ের শৃঙ্গের মতন মেঘের দিকে উঁচু হয়ে উঠেছে, অতিকায় দানবদের মতন যেন বিরাট পা ফেলে তারা এগিয়ে চলেছে···"

হুগোর সাহিত্য আমাদের মনে সেই বিশালতার, সুগভীরতার, মৃত্যুহীনতার স্পন্দন এনে দেয়।

বর্তমানে যে ছোট্ট কাহিনীটি এখানে অনুবাদ করা হয়েছে,

তার মধ্যে হুগোর কাহিনীর বিস্তার দেখা যায় না বটে কিন্তু তার মধ্যে আছে তাঁর সুগভীরতা। ফাঁসির আগে দণ্ডিত-আসামীর মনকে তিনি রূপ দিয়েছেন এই অপরূপ কাহিনীতে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে এই রহস্যময় লগ্নটীকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। অনুবাদক এই কাহিনীটিকে নির্বাচিত করে তাঁর রস-জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন এবং আমার বিশ্বাস, বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা এই কাহিনীর ভিতর হুগোর রচনার সেই অপরূপ প্রাণ-স্পর্শের সন্ধান পাবেন, একটা নতুন অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[এক]

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত···

পাঁচটি সপ্তাহ ধরে মনে শুধু এই এক চিন্তা—একা, নিশ্চল এই গুরুভার বহন করে চলেছি, আনত হ'য়ে পড়েছি চিন্তার গুরুভারে।

অনেকযুগ আগে—কারণ, এখন আমার কাছে এক একটি মুহূর্ত এক একটি বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে—আমি ছিলাম দুনিয়ার আর সবারই মতো। প্রতি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত ছিল মুক্ত, কল্পনায় রঙীন। স্বপ্নেভরা ভাবপ্রবণ ছিল আমার তরুণ মন। জীবনজালের রুক্ষ গ্রন্থিগুলো অশেষ কৌশলে জোড়া দিয়ে অসম্বদ্ধ, বিশৃঙ্খল, সীমাহীন, দুর্বার কল্পনার পাট ভাঙ্‌তে আমি পেতাম অপরিসীম আনন্দ।

অবাধে তখন কল্পনার রথে উধাও হয়ে ছুটতাম···মনে হতো, অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্য আমারই জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে চারদিকে—চির-বিজয়ী আমি—আমাকে অভিনন্দন দেবার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে দীপালোক-শোভিত আনন্দ-কোলাহলমুখর পৌরভবন—পল্লব-ঘন বট-বীথি-বেয়ে অনুপমা তরুণী পাশে নিয়ে, আমি চলেছি রাত্রির অন্ধকারকে অন্তরের আনন্দে উজ্জ্বল ক'রে।

অফুরন্ত অবসর ছিল আমার ভাবনার। বাধাহীন, বিচিত্র, স্বাধীন ছিল আমার মনের গতি!

বন্দী! এখন আমি বন্দী। কারারুদ্ধ, শৃঙ্খলিত আমার দেহ···মন শুধু একটি মাত্র চিন্তায় আকুল, আচ্ছন্ন। ভয়াবহ, রিক্ত, সুকঠিন ভাবনা। একটিমাত্র অনুভূতি, একমাত্র নিশ্চয়তা—

প্রা ণ দ ণ্ডে দ ণ্ডি ত···

এই দুশ্চিন্তা আমার সকল কাজে গভীর একটি ছায়ামূর্তির মতো থাকে ঘিরে—একা, সর্বেশ্বরী সে-ভাবনা, তার কাছে আর কোন ভাবনাকেই দেয় না ঘেঁসতে।

যখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি কিংবা চোখ বুজে থাকি, তখনই সে তার তুহিন-শীতল হাত দিয়ে আমাকে দেয় নাড়া। কানে কানে বলে—দুর্বোধ এক বাণী, আমি শুনি, বুঝি, আবার পরক্ষণেই হারিয়ে ফেলি তার রেশটুকু।

আমার সকল চিন্তাকে সে করে অনুসরণ; গানের ধুয়োর মতো আমার বলা প্রত্যেকটী কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ফেরে।

জেগে থাকি যখন, তখন সে লৌহকারায় বদ্ধ আমায় করে উত্যক্ত, ঘুম-ভাঙার ক্ষণে গোপন দৃষ্টি হানে, আবার স্বপ্নে দেয় দেখা—দুঃস্বপ্নের বেশে।···

ঘুম থেকে জেগে উঠেছি চমকিত হয়ে। মনে মনে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছি—সে একটা দুঃস্বপ্ন বই-তো নয়।

কিন্তু চারদিকের রূঢ় বাস্তবতা এক নিমিষে সে চিন্তার বিলাসিতা ভেঙ্গে দেয়। কারাকক্ষের সেই অস্পষ্ট আলোকে,

নিজের দেহের কারাবন্দীর পোষাকে, কারাকক্ষের জানালার বাইরে দণ্ডায়মান সশস্ত্র কারা-প্রহরীর মূর্তিতে, নিজের বাস্তবতা উপলব্ধি করবার আগেই কে যেন আমার কানে বলে গেল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তুমি !

[দুই]

মাত্র চার সপ্তাহ আগে হয়েছে আমার বিচার···

বিচারে প্রমাণিত হয়েছে আমার অপরাধ, দণ্ডিত হয়েছি আমি···

সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে স্মৃতিপথে আনবার চেষ্টা করছি।··· বসন্তের মনোরম প্রভাতে···

আমার বিচার চলছে তিনদিন ধরে। আমার নামে ও অপরাধে কৌতূহলী অগণিত দর্শক মৃতদেহের চতুষ্পার্শ্বে মাংসভূক্ শকুনির দলের মতো বিচারগৃহে জনসাধারণের নির্দিষ্ট আসনগুলো করে ফেলতো পূর্ণ। তিনটি দিন ধ'রে ছায়ামূর্তির মতো আমার সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করেছে—বিচারক, সাক্ষী, কৌঁসুলী···কখনও বিকটাকার, কখনও [illegible]ত তাদের দৃষ্টি—গম্ভীর, ভীতিপ্রদ।

উৎকণ্ঠা আর ভয়ে প্রথম দু'টি রাত্রি বিনিদ্রভাবেই করেছি যাপন। তৃতীয় দিনে শ্রান্তি আর উদ্বেগ এনেছিল নিদ্রা।

মধ্যরাত্রিতে চিন্তাক্লিষ্ট জুরীদের কাছ থেকে আমায় স্থানান্তরিত করা হলো···

প্রহরীরা আমায় নিয়ে এলো···কারাকক্ষে।

তৃণ-শয্যায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি।

অনেক দিনের পর এই আমার প্রথম কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম। যখন আমায় জাগানো হলো, তখনও ঘুম লেগে ছিল আমার চোখে।

জেলারের পেরেক-আঁটা বুটের শব্দ, তাঁর চাবির তোড়ার ঝন্‌ঝনানি, লৌহশলাকার কর্কশ কড়্ কড়্ আওয়াজ, সেদিন যথেষ্ট ছিল না আমার নিদ্রা ভাঙাবার পক্ষে।

কঠোর, কর্কশভাবে কানে এসে বাজলো জেলারের কণ্ঠস্বর—। আমার বাহুতে তাঁর কঠিন হাতখানি রেখে বল্‌লেন : ওঠো, সোজা উঠে এসো···!

চোখ খুলে হতভম্বের মতো উঠে বসলাম।

দেখলাম—আমার কারাকক্ষের উঁচু সরু জানালা দিয়ে পাশের খোলা বারান্দার ছাতে সূর্যের ক্ষীণ রশ্মি এসেছে নেমে। কারা-প্রাচীরের ছায়া দেখতে অভ্যস্ত আমার তু'টি আঁখি সেই ক্ষীণ আভাকে সূর্যেরই মতো অভিনন্দন জানাতে কি ব্যগ্রই না হয়েছিল!

সূর্যালোক কত ভালবাসি আমি···!

আমি আলোর রাজ্যের মানুষ···আলোয় বঞ্চিত···হায়।

জেলারকে বললাম···চমৎকার দিন।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। হয়তো-বা চিন্তা করলেন আমার সঙ্গে বাক্যালাপে সময় নষ্ট করা সমীচীন কি না।

তারপর একটু অস্বাভাবিক জোর গলায় বললেন···হ'তে পারে।

আমি স্থির, আধ-জাগ্রত, স্মিতানন। ছাতে-পড়া কোমল সোনালি প্রতিচ্ছবিটির উপর নিবদ্ধ আমার দৃষ্টি···!

সুন্দর দিন···আবার বললাম আমি।

জেলার বল্‌লেন···হ্যাঁ, ওঁরা সবাই তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন।

এই একটিমাত্র কথা আমার কল্পনার গতি ব্যাহত করলো··· যেন মাকড়সার জাল অতর্কিতে রুদ্ধ করলো পতঙ্গের বেগ।

সংজ্ঞা ফিরে পেলাম।

আদালতের বিষণ্ণ কক্ষখানি ভেসে উঠ্‌লো আমার চোখের সামনে। দেখলাম—লাল পোষাক-পরা অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট বিচারকদের। সাক্ষীরা নির্বোধের মতো সারিবদ্ধভাবে তাদের আসনে সমাসীন···আমার বেঞ্চির দু'ধারে দু'জন সান্ত্রী দণ্ডায়মান। তাদের পরণের জামা কালো।

দেখতে পেলাম···আঁধারের মধ্যে আদালত-গৃহের পেছনে সমবেত জনতার উন্নত শির। তাদের দৃষ্টি বিদ্ধ করেছিল আমাকে···আর আমি যখন ছিলাম নিদ্রামগ্ন তখন—জেগে বসে-থাকা বারোজন জুরীকে···!

—উঠলাম···!

আমার দাঁত ঠক্ ঠক্ করে উঠলো···হাত কাঁপলো, পরণের কাপড় পেলাম না খুঁজে, পা অবশ হ'য়ে পড়লো।

প্রথম পদক্ষেপে অতি গুরুভারবাহী বাহকের মতো হোঁচট্ খেয়ে পড়লাম। তবুও, জেলারকে অনুগমন করে চলেছি।

দু'জন সশস্ত্র প্রহরী অপেক্ষা করছিল আমার সেল-এর বাইরে। তারা আমার হাতকড়ি লাগিয়ে তার সঙ্গের ছোট্ট তালাটি বন্ধ করলো···সন্তর্পণে।

কোন আপত্তি করলাম না আমি। যন্ত্রের উপর যন্ত্র!

ভিতরের আঙিনাটি পার হয়ে গেলাম।

প্রভাতের স্বচ্ছ শীতল সমীর সঞ্জীবিত করলো আমায়। মাথা তুলে চেয়ে দেখলাম—আকাশ নীল,—দীপ্ত সূর্যালোক কারাগারের তমসাচ্ছন্ন উন্নত প্রাচীর-গাত্রে সৃষ্টি করেছে···আলোকের একটী সুবৃহৎ কোণ।

—সত্যিই, দিনটী ছিল ভারী সুন্দর।

উঠলাম···একটা প্যাঁচালো সিঁড়ির উপর: একটির পর একটি করে পেরিয়ে এলাম—তিনটি বারান্দা···।

তারপর, খোলা হলো নীচু একখানি দরজা।

এক ঝলক তপ্ত বাতাস এসে লাগলো আমার মুখে। আদালতে সমবেত জনতার নিশ্বাস···!

প্রবেশ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—একটা গুন্ গুন্ আওয়াজ। বেঞ্চিগুলো সরানো হলো। সৈন্যবেষ্টিত আমি লম্বা ঘরখানিতে ঢুকলাম।

মনে হলো আমার চারদিকে যা কিছু রয়েছে, আমিই যেন তার কেন্দ্র। সকলের বিস্ময়ের বস্তু, সবাকার কৌতূহলের সামগ্রী। আসামী,···বন্দী আমি···যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগশিশুরই মতো অসহায়!

[তিন]

দেখলাম—আমার হাত খোলা, বুঝতে পারলাম না কোথায়, কখন বন্ধন হয়েছে অপসারিত···!

তারপর অনন্ত নীরবতা।

আদালত-প্রকোষ্ঠে আমারই জন্য নির্দিষ্ট যায়গায় পৌঁছলাম। মুহূর্তে থামলো জনতার কোলাহল। আমার মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তার গতিও সেই সঙ্গে হলো রুদ্ধ।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—এতক্ষণ যা ছিল অস্পষ্ট। উপলব্ধি করলাম—চরম সিদ্ধান্তের মুহূর্ত সমাগত, দণ্ডাদেশের প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি দাঁড়িয়ে।

বল্‌তে পারেন···এ ধারণা যখন আমার মনে জাগলো, তখন আমার অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো না কেন?

মুক্ত বাতায়ন।

বাইরে থেকে বাতাসে অনাহতভাবে ভেসে আসছে—নগরীর কোলাহল।

কক্ষটি উজ্জ্বল···যেন চলেছে কার শুভ পরিণয়ের আয়োজন। শুধু সূর্যালোক ঝলমল করছিল জানালাগুলোর উপর, টেবিলের উপর পড়েছিল ঋজুভাবে, কোথাও বা দরজায় পাচ্ছিল বাধা, কোথাও বা খোঁপগুলোর ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে এক টুক্‌রো সোনালি সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

বিচারকদের দৃষ্টি হর্ষোৎফুল্ল। তাঁদের কাজ শেষ হয়ে এসেছে···তাই বুঝি! সভাপতির সৌরকিরণদীপ্ত মুখখানি দেখাচ্ছিল শান্ত, নমনীয়। একজন তরুণ সহকারী কৌসুলী

বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁরই পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি রূপসী তরুণীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন মস্‌গুল হয়ে—তরুণীর বস্ত্রাঞ্চলখানি অন্যমনস্কভাবে নাড়তে নাড়তে।

শুধু জুরীরাই ছিলেন বিষণ্ণ--হয়তো বা রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত। কেউবা হাই তুলছিলেন। তাঁদের চেহারায় এমন কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না যা থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁরাই চরম দণ্ড বিধান করবেন।

দেখলাম···সমবেত নাগরিকদের চোখে ঘুমের একটা আবেশ আছে লেগে···।

সামনের দিকের জানালাটি ছিল খোলা। বাইরে রাস্তায় ফুলওয়ালীদের হাসির রোল কানে এসে বাজছিল। জানালার নীচে পাথরখানির উপর ছোট্ট একটা সুন্দর হল্‌দে গাছ দেয়ালের ফাটলের উপর পড়েছিল ঝুঁকে।

কোন অশুভ কি চারিদিকের এই সৌন্দর্যের অনুভূতিকে নষ্ট করতে পারে···! সূর্যালোক আর নির্মল বাতাসে শুধু মুক্তি ছাড়া আর কি কিছু কল্পনা করা যায়···?

আমায় ঘিরে-থাকা দিনটির মতো আমার মনখানিও ভরে উঠলো আশায়। দণ্ডাদেশের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইলাম,···

ইতিমধ্যে এলেন আমার কৌঁসুলী। তাঁরা সবাই আমারই অপেক্ষায় ছিলেন।

তৃপ্তির সঙ্গে প্রাতভোজন সেরে এসেছেন তিনি। তাঁর যায়গায় পৌঁছে মুচ্‌কি হেসে আমার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

বললেন···আমার আশা হচ্ছে।

আনন্দের সঙ্গে জবাব দিলাম···আমারও···!

মুখে ফুটে উঠলো ক্ষীণ হাসি।

কৌঁসুলী বললেন···এখনও পর্যন্ত তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিনা কিছুই। তাঁদের পূর্ব ধারণা বদলে গেছে নিশ্চয়। সুতরাং যাবজ্জীবন দণ্ড হবে বলেই আমার মনে হচ্ছে।

ভীষণ আহত হয়ে বললাম...এ কি বল্‌ছেন? তার চেয়ে বরং মৃত্যুই ভালো! হ্যাঁ,···মৃত্যু···

এই একটিমাত্র কথা উচ্চারণ করে চঞ্চল হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম···একথা বলে কি দোষ করলাম?

মৃত্যুদণ্ড কি কখনও, রাত্রি নিশীথের তমসাবৃত কক্ষের ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ছাড়া উচ্চারিত হয়েছে!···

কখনও না, এই সুন্দর আলোকে, মৃত্যুদণ্ড, এ একেবারে অসম্ভব!

এমনি এক সুন্দর প্রভাতে এই সব সাধু জুরীরা, কি চরম দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন?...পারেন না...!

চোখ পড়লো...সূর্যালোক-স্নাত হল্‌দে ফুলটির উপর।

সভাপতি মশায় আমায় দাঁড়াবার আদেশ দিলেন।

সৈন্যেরা যেন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় কাঁধে নিল বন্দুক। সবাই উঠে দাঁড়ালো...মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

নিরীহ, গোবেচারী, বৈশিষ্টহীন একটি লোক "সেল"-এর নিচে একখানি টেবিল সামনে রেখে বসেছিল।

বোধ হয়, সে আদালতেরই একজন কেরানী।

আমার অনুপস্থিতিতে জুরীরা আমার অপরাধের যে বিবরণ য়েছেন, সে তা পাঠ করলো জোর গলায়।

স্বেদবিন্দু নেমে আসতে লাগলো আমার পা বেয়ে। দেয়ালে স দিয়ে রইলাম...যেন মাটিতে পড়ে না যাই।

সভাপতি আমার কৌসুলীকে জিজ্ঞাসা করলেন...দণ্ডাদেশের রুদ্ধে আপনার কিছু বলবার আছে কি···!

আমার নিজের বক্তব্য ছিল অনেক কিছুই। কিন্তু বাক্‌শক্তি হত হয়েছিলাম আমি।

কৌসুলী উঠে দাঁড়ালেন...

বুঝলাম...তিনি দণ্ড লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ার্থনা জানাতে উদ্যত হয়েছেন।

ঘৃণায় ভরা রোষ ছাপিয়ে উঠেছিল আমার মনের শত সহস্র াবেগকে। উচ্চৈঃস্বরে আগের কথাগুলোবই পুনরুক্তি করবার ইচ্ছা লা.. তার চেয়ে মৃত্যুই ছিল শ্রেয়। রুদ্ধ হয়ে এসেছিল নিশ্বাস।

তাকে আমার বাহু দিয়ে নিবৃত্ত করে অবরুদ্ধ কণ্ঠে নলাম...না!

সরকার পক্ষের কৌসুলী আমাব কৌসুলীর কথার প্রতিবাদ ানালেন। সংজ্ঞাহীন তৃপ্তির সঙ্গে আমি শুনলাম তাঁর থাগুলো···।

বিচারক আর জুরীবা আদালত কক্ষ ত্যাগ করলেন। ল্পক্ষণ পরেই আবার তাঁরা এলেন ফিরে।

—সভাপতি দণ্ডাদেশ পাঠকরলেন।

সমবেত উৎসুক জনতা যুগপৎ চিৎকার করে উঠলো···প্রাণদণ্ড!

যখন আমায় সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছিল তখন সবাই হুড়মুড় করে চলেছিল আমার সঙ্গে সঙ্গে। হতবুদ্ধি···হতজ্ঞান হয়ে চলেছিলাম আমি।

আমার অন্তরে জ্বলছিল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা।

মৃত্যুদণ্ড-লাভের আগে আমার নিশ্বাস বইতো, শিরায় বয়ে যেতো রক্তস্রোত, আমি ছিলাম আর সবারই মতো একজন। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম···আমার আর পৃথিবীর অপর লোকগুলোর মধ্যে অতল-স্পর্শ সমুদ্রের দুরতিক্রমনীয় ব্যবধান। চোখের পলকে সবই যেন হয়ে গেল পরিবর্তিত।

এই আলো-পথ, এই সুন্দর সূর্য, নির্মল বাতাস, ঐ গন্ধভরা ফুল, সবই যেন ম্লান, সিত—শবাচ্ছাদন-বস্ত্রেরই মতো। আমার চারদিকের লোকগুলো যেন ছায়ামূর্তি!

সিঁড়ির নিচে একখানি কালো, নগ্ন লৌহ-শলাকায় ঘেরা গাড়ি অপেক্ষায় ছিল আমারই জন্যে।

গাড়িতে চড়বার সময় হঠাৎ সামনের খোলা যায়গাটির উপর আমার চোখ পড়লো।

গাড়ির দিকে দৌড়ে এসে পথিকরা চিৎকার করে উঠলো... ফাঁসির আসামী।

দু'টি ছোট্ট মেয়ের দৃষ্টি আমাকেই করেছিল অনুসরণ। ওদের মধ্যে ছোটটি হাততালি দিয়ে বললো...বাঃ—কী মজা—এ লোকটি ছ'হপ্তার মধ্যে মরবে,...কেমন মজা...!

[চার]

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত !...

ফাঁসি ! কী হয়েছে তাতে...

কবে পড়েছিলাম এক বইতে...বইখানির নাম ঠিক মনে পড়ছে না—প্রত্যেক মানুষই অনির্দিষ্ট এক মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড পেয়ে থাকে।

তাহলে কী পরিবর্তন হলো আমার অবস্থায় ?

যারা দীর্ঘ জীবন কামনা করেছিল তাদের কতজনই না আমার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হবার পরে মরণের কাছে করেছে আত্মসমর্পণ, তরুণ, স্বাস্থ্যবান, স্বাধীন কত লোক...যারা ঔৎসুক্যের সঙ্গে গুনছে আমার ফাঁসির দিন.. জীবনের পরপারে চলে যাবে স্বাভাবিকভাবে.. আমার আগেই।

আজ যারা আসা-যাওয়া করছে, সেবন করছে মুক্ত বাতাস, তাদের অনেককেই হয়তো পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে এরই মধ্যে।

তাই যদি হোল, তা'হলে জীবনের এমন কিই বা মোহ, যে জীবন হারাতে মনে জাগবে দুঃখ ?

বস্তুত...জহ্লাদ আমায় বঞ্চিত করতে পারে শুধু আমার দুঃখময় দিন, কালো রুটি, কয়েদীর খাদ্য পাতলা যূষ, জেলার আর সান্ত্রীদের রূঢ় আচরণ থেকে...

উঃ! তবু—ভীষণ—ভয়ানক—অসহ্য—অচিন্তনীয় !

[পাঁচ]

আমি এসেছি এই গোপন অন্ধকার কারাগারে, ঐ কালো গাড়িখানিতে চড়ে।

দূর থেকে মনে হয়—এই অট্টালিকার চারপাশে রয়েছে কি যেন অপরূপতা।

চক্রবালের বিপরীত দিকে পাহাড়ের সম্মুখে তার এই অবস্থা তাকে দিয়েছে রাজপ্রাসাদেরই প্রাচীন আভিজাত্য।

কাছে গেলেই ধরা পড়ে তার পতনোন্মুখ ভগ্ন দেহ, জেগে ওঠে চক্ষুঃশূল। কি একটা বিচ্যুতি, কি এক দৈন্য নষ্ট করেছে এই সৌধখানির মনোহারিতা।

দেয়ালগুলো ফুটো, জানালার কাঠামো নেই, কাচ নেই, —শক্ত লোহদণ্ডের সঙ্গে দু'একটি কয়েদীর নগ্ন মুখ লগ্ন হয়ে আছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ জীবন!···

এখানে আসা মাত্রই লোহার হাত আমায় পাকড়াও করলো।

সতর্কতা বাড়লো। একটি বেনিয়ান আর একটি শক্ত কাপড়ের জাঙ্গিয়া পরানো হলো আমায়।···

···শাস্তি মকুবের আবেদন জানালাম।

আরো পাঁচ ছ'টি সপ্তাহ জেলারের ঘাড়ে থাকবে দায়িত্ব। ফাঁসিতে লটকাবার জন্য আমায় রাখতে হবে—সুস্থ, নিরাপদ।

প্রথম ক'দিন ওরা আমায় দেখালো অদ্ভুত এক দয়া। কিন্তু তা' যে আমার কাছে ভয়ানক!

চাবিগুলোর দৃষ্টিতে আমি পেতাম মশানমঞ্চের উদগ্র গন্ধ। সৌভাগ্যের বিষয়, ক'দিনের মধ্যেই অভ্যাসের প্রভাব এসে পড়লো আমার উপর। একটু উন্নত ধরণের হলো আমার সাধারণ কর্মধারা।

আমায় অপরাপর কয়েদীদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ দেওয়া হলো, কিন্তু পার্শ্বচর চলতে লাগলো ঠিক সমানতালেই। যে অস্বাভাবিক সৌজন্য সর্বদা আমার মনে জাগিয়ে তুলতো ফাঁসির চিন্তা, তা থেকে আমি পেলাম অব্যাহতি।

শুধু তাই নয়...

আমার যৌবন, আমার নমনীয়তা, কারাধ্যক্ষের সুদৃষ্টি, সর্বোপরি, দুর্বোধ ভাষায় প্রধান রক্ষীকে আবেদন জানানোর ফলে আমায় সপ্তাহান্তে একবার অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে অবাধ ভ্রমণের অধিকার দেওয়া হলো। যে কঠোর পরিবেষ্টন আমায় একেবারে পঙ্গু করে রেখেছিল- আমি নিষ্কৃতি পেলাম তার হাত থেকে। আমায় কালি-কলম, কাগজ ও একটি বাতি দেবার হুকুম হোল···!

প্রতি রবিবারে উপাসনার পরে, ছুটির সময় আমি উঠানে বেড়াতে পারি। বন্দীদের সঙ্গে কথা বলি অবাধে, স্বাধীনভাবে ও নিঃসঙ্কোচে।

বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক তারা। বেচারীরা!

তারা আমায় শোনায় তাদের অপরাধের কাহিনী। শুনে চমকে উঠি; কিন্তু জানি, তারা তা'তে অনুভব করে আনন্দ আর গর্ব।

গল্প···

গল্পচ্ছলে তারা করে ইতর, অভদ্র আলাপ। তারা আমায় শেখাতে চায়.. তাদের অদ্ভুত ভাষা, নতুন শব্দ ব্যবহার-রীতি!

ফাঁসিতে যাওয়াকে তারা বলে...বিধবাকে বিয়ে করা; অর্থাৎ...ফাঁসির দড়িটুকু···যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, তাদেরই বিধবা পত্নী।

প্রতি মুহূর্তে কদর্য রহস্যালাপ!

ওরা যেন বিষধর। তাদের ভাষা শোনার ফল—কম্বল থেকে ধূলো ওড়ানোরই মতো।

আমায় অনুকম্পা দেখায় তারা। জেলার, রক্ষী...সবাই গল্প করে আমাব সঙ্গে, হেসে কথা বলে, আমার সম্বন্ধে করে আলোচনা, আমায় মনে করে···পশুর মতো নির্বোধ।

[ছয়]

আপন মনে প্রশ্ন করলাম—আমার সামনে রয়েছে লিখবার সকল সরঞ্জাম। আমি লিখবো না কেন?

কিন্তু কি লিখবো...! কি সম্বন্ধে লিখবো...

চারিদিক আবেষ্টিত শীতল নগ্ন পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে আমি আবদ্ধ, পথ-চলার স্বাধীনতা আমার নেই। দিক্-চক্রবাল আমার দৃষ্টিপথের বাইরে।

আমার একমাত্র কাজ...আমার সামনের দিকের ছায়া-ঘেরা দেয়ালের দরজায় ছিটকে পড়া বাধাপ্রাপ্ত আলোটুকুকে দরজার ছিদ্রপথ দিয়ে লক্ষ্য করা। একমাত্র দুশ্চিন্তা—অপরাধ, শাস্তি,

হত্যা আর মরণের। দুনিয়ায় আর কোন কর্তব্য নেই আমার, কি আমি করতে পারি...

আমার এই শুষ্ক রিক্ত মস্তিষ্কে লিখবার কি-ই বা উপকরণ থাকতে পারে ?

কেন থাকবেনা !

যদি চারদিকের সবই বর্ণহীন, নির্জীব একঘেয়ে হয়, তবে আমার মধ্যে কি একটা ঝড়, একটা সংগ্রাম, একটা বিয়োগান্তকতা নেই !

এই নির্দিষ্ট ভাবটি...দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই... প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি পলে কি নতুন আকারে, ভীষণতব, নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠ্ছে না...!

একা, নিসঙ্গ অবস্থায় আমার সকল তীব্র অনুভূতপূর্ব আবেগ, সকল অনির্দিষ্টতা কি হয়ে উঠেনি আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল ?

সত্যই উপকরণ রয়েছে প্রচুর।

যতই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন আমার জীবন, তবু, তার মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট ভয়, যথেষ্ট বেদনা যা ভরে তুলেছে আমার শেষ মুহূর্তগুলি।

আমার কলমের কালি হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে সে-বেদনা ভাষায় প্রকাশ করতে।

তা ছাড়া আমার এই দুঃখ লাঘব করবার একমাত্র উপায়— তাকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা আর তারই বর্ণনায় মনের গতি ফিরিয়ে নেওয়া।

আমি যা লিখবো তা হয়তো নিরর্থক হবেনা। আমার দুঃখের এই রোজনামচা, প্রতি মুহূর্তে, দণ্ডে দণ্ডে আমার এই নিপীড়নের কাহিনী, আর বেদনার ইতিহাস যদি লিপিবদ্ধ করে যেতে পারি—যতক্ষণ না তা অসহ্য হয়ে পড়ে দৈহিকভাবে। —তাহলে অসম্পূর্ণ হলেও যতদূর সমাপ্ত হবে সেটুকুও কি জগতকে গভীর একটা শিক্ষা দেবে না? এই ক্রমবর্দ্ধমান বেদনার মধ্যে, দণ্ডিতের ওপর দিয়ে যে দৈহিক আর মানসিক নির্যাতনের পরীক্ষা চলেছে, তার মধ্যে দণ্ডদাতার জন্য কি কোন শিক্ষাই থাকবে না?

হয়ত এই কাহিনী পাঠের পর আবার কারো শির এমনিভাবে বিচারের পাল্লায় তুলে দিতে দণ্ডদাতা হবেন অধিকতর সতর্ক। দণ্ডদাতারা কি একবার চিন্তাও করেন না—এই দণ্ডাদেশের মধ্যে পুঞ্জীকৃত হয়ে আছে কত নিপীড়ন, কি অমানুষিক অত্যাচার, তাঁরা কি একবারও ভেবেছেন, যে কণ্ঠ রজ্জুবদ্ধ করবার আদেশ দিলেন, তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে একটি মন, আছে একটি আত্মা যা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় নি?

না।

ফাঁসির রজ্জু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননা তাঁরা। তাঁরা নিশ্চয় ভাবেন—দণ্ডিতের পূর্বাপর কিছুই নেই। এ লেখাটি তাদের চোখ ফুটিয়ে দেবে। কোনদিন যদি এটি প্রকাশিত হয় তাহলে তাঁরা দণ্ডিতের মনোবেদনা সম্বন্ধে মুহূর্তকাল চিন্তা করবেন।

তাঁদের অচিন্তিতপূর্ব অনেক কিছুই থাকবে এখানে।

দেহকে পীড়ন না করে একেবারে নষ্ট করতেই তাঁরা গৌরববোধ করেন বেশি।

এ কী জঘন্য বিচার!

মানসিক যন্ত্রনা কিছুই নয়!

ঘৃণা আর অনুকম্পা! এই বুঝি আইন? আসবে—আসবে সেইদিন। হয়তো এই সঙ্গীহীন হতভাগ্যের শেষ স্বীকারোক্তি, এই স্মরণালেখ্যই আনবে সেই চরম দিনটি—যদি আমার মৃত্যুর পর কাগজেব এই পৃষ্ঠাগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আদালতকক্ষের মেঝেয় পড়ে কর্দমালিপ্ত না হয়, অথবা রক্ষীর ভাঙ্গা জানালার খড়খড়ির উপর উড়ে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে গলে না যায়!

[সাত]

তবে—আজ আমি এখানে বসে যা লিখছি তা একদিন অপরের কাজে আসবে, ভাবিয়ে তুলবে দণ্ডদানোন্মুখ বিচারককে, আমি যে যাতনা ভোগ করছি—দোষী কিংবা নির্দোষী হতভাগ্যদের সেই যন্ত্রণা থেকে দেবে অব্যহতি।

তাতে আমার কি?

আমার প্রাণই যদি গেল, তবে অপরের প্রাণ গেলে বা থাকলে আমার কি যায় আসে?

কী নির্বোধের মত ভাবছি আমি! নিজে ফাঁসিতে প্রাণ হারাবার পর নষ্ট করবো ফাঁসির মঞ্চ···

কি?

এই সূর্য, এই বসন্ত, পুষ্পশোভিত কানন, প্রভাতের কলবিহগ, গাছ-পালা, প্রকৃতি, স্বাধীনতা, জীবন—এরা আমার জন্য নয় ?

হায়-রে !—তবুও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে।

সত্যই, তা কি অসম্ভব ?

নিশ্চয় আমি মরবো—শিগ্‌গিরই—কাল প্রভাতে—হয়তো-বা আজ !

তাই কি ?

উঃ ! কি ভয়াবহ অনুভূতি !

কারা-প্রাচীরে মাথা ঠুকে করবো আত্ম-হত্যা ?

[আট]

দেখা যাক, দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপরাধীদের সাধারণতঃ ক'দিনের মধ্যে ফাঁসিতে লটকানো হয়।

দণ্ডাদেশের পর আপীলের জন্য সময় পাওয়া যায়—তিন দিন। আপীলের এক সপ্তাহ পরে নিম্ন আদালত থেকে নথিপত্র যায় উচ্চ আদালতে। নিম্ন আদালত থেকে নথির কাগজপত্র পরীক্ষা করে নথি পাঠাতে সময় লাগে পনেরো দিনের মতো।

তারপর মোকদ্দমার শ্রেণী-বিভাগ হয়, নম্বর দেওয়া হয়, ক্রমিকভাবে চলে সেগুলোর শুনানী। আরো দু'সপ্তাহ দেরী হয় তারপর।

অবশেষে আদালত বসে।

সাধারণতঃ বৃহস্পতিবারেই এ-সব মোকদ্দমার শুনানী হয়।

বিচার আসনে বসেই বিচারক গড়্-পড়্তা কুড়িটি মোকদ্দমা খারিজ করে দেন। নথিগুলো আবার ফেরৎ যায় নিম্ন আদালতে। সেখান থেকে সেগুলো পাঠানো হয়—প্রধান সরকারী কৌঁসুলীর কাছে।

তিনি নথিগুলো দেন জেলারকে, জেলার সোজা জল্লাদের কাছে পাঠান সেই চরম আদেশ। তাতে সময় লাগে তিন দিনের মতো।

চতুর্থ দিনের প্রভাতে সরকারী প্রধান কৌঁসুলী ফাঁসির আদেশ তৈরি করেন।

পরদিন সকাল থেকে মশানমঞ্চ তৈরি করার শব্দ আর রাজপথে জনতার কোলাহল শোনা যায়।

একুনে, ছ'সপ্তাহ !

ঠিকই বলেছে সেই ছোট্ট মেয়েটি।

অন্ততঃ পাঁচ—হয়তো বা ছয়—(নতুন কারাগারে স্থানান্তরিত হবার পর আমি দিন গুণবার সাহস পাই নি) সপ্তাহ ধরে আমি বাস করছি এই কারাগারে।

তার চেয়েও তিন দিন বেশি এখানে রয়েছি।

[নয়]

এই মাত্র আমার দানপত্রখানি লেখা শেষ করলাম।

কি দরকার ছিল তার ?

আমি মরবো।

আমার পরিবারের খরচের তুলনায় যথেষ্ট নয় আমার সম্পত্তি।

জোর করে প্রাণ দেওয়াও ব্যয়সাপেক্ষ।

আমার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে আমার মা, স্ত্রী আর আমার শিশু কন্যাটি।

তিন বছরের শিশু—সুন্দর, টুকটুকে, ছিপছিপে। কালো দুটি চোখ, লম্বা পাণ্ডুর কেশ।

তাকে যখন শেষবার দেখি, তখন তার বয়স ছিল দু'বছর একমাস।

আমার জীবনান্ত হবার পরে পড়ে থাকবে তিনটি অনাথা—পুত্রহীনা, স্বামীহীনা, পিতৃহীনা। তিন রকমের তিনটি অসহায়া!...

স্বীকার করি, আমি ন্যায়ভাবেই হয়েছি দণ্ডিত। কিন্তু এই যে তিনটি নির্দোষ প্রাণী—এরা কি করেছে?

কিছুই করেনি। তবু, তারা হবে অসম্মানিত, উৎসন্ন যাবে... কষ্ট পাবে।

বিচার কি এই?

মার জন্য চিন্তা নেই। চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধা তিনি। এ নিদারুণ শোক সামলাতে না পেরে, হয়তো মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবেন।

পত্নীর কথাও ভাবি না। তার শরীর খারাপ, দুর্বল মন। সেও মরবে—অবশ্য যদি পাগল হয়ে না যায়। লোকে বলে, তা'হলে সে বাঁচবে। কিন্তু যা হোক্, তা'হলেও মনোবেদনা পাবেনা সে। সে ঘুমাবে—মৃতের মতোই থাক্‌বে বেঁচে।

কিন্তু আমার মেয়ে—আমার, শিশু-কন্যা মেরী। সে হাসে,

খেলে, কথা বলে আপন মনে আধ-অস্ফুটস্বরে, বুঝ্‌তে পারেনা ভালমন্দ কিছুই ! আমার সমস্ত অন্তর যে তারই জন্য ব্যাকুল !

কোন অপরাধ নেই তার, তবু তার এ শাস্তি। সে কি আইনের বাইরে, আইন কি তার কথা চিন্তাই করবে না ?

[দশ]

এই আমার কারাকক্ষ। চার হাত উঁচু, পাশে এক গজ, বাইরের বারান্দাখানির মেঝের পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে চারটি দেয়াল।

ডানদিকের প্রবেশপথে একখানি বিরামকক্ষ, সেখানে পড়ে আছে এক তাড়া খড়। তারই উপর কয়েদীরা তাদের ডোরা ইজার পরে আধা-শার্ট গায়ে দিয়ে শীত-গ্রীষ্মে বিশ্রাম করে, ঘুমায়।

মাথার উপরে আকাশের বদলে আড়কাঠের খিলান, তাতে ন্যাকড়ার মতো ঝুলছে—মাকড়সার ঘন জাল।

অপর কক্ষগুলোর জানালা নেই—এমন কি বায়ু-প্রবেশের ছিদ্রটি পর্যন্ত নেই। লোহার পাতের একখানিমাত্র দরজা।

না—ভুল হয়েছে আমার।

দরজার মাঝখানে, উপরের দিকে চতুষ্কোণ একটি ছিদ্র, একটি তারের জাফ্‌রি। চাবি দিয়ে রাতের বেলায় দরজাখানি বন্ধ করতে পারা যায়।

বাইরে বেশ প্রশস্ত একখানি বারান্দা—আলোয় ভরা, দেয়ালের মাথার উপরের ছিদ্রপথে আসা বায়ুতে পরিপূর্ণ।

বারান্দাখানি ক'টি কক্ষে বিভক্ত। কয়েকটি লম্বা। কোনটি বা চক্রাকার, দরজার সঙ্গে সংযুক্ত। তার প্রত্যেকটি কামরা আমার প্রকোষ্ঠের মতো, পার্শ্বপ্রকোষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

জেলের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দণ্ডিত কয়েদীদের সেখানে রাখা হয় আটক।

প্রথম তিনখানি 'সেল' মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অপরাধীদের জন্যই নির্দিষ্ট—কারণ, সেগুলো রক্ষীর কক্ষ-সংলগ্ন, তাই—পাহারা দেবার পক্ষে সুবিধাজনক।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাকি এই 'সেল'গুলো তৈরী করেছিলেন, উইনচেষ্টারের কার্ডিন্যাল্—যিনি জোয়ান অব্ আর্ককে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

সেদিন ক'জন কৌতূহলী দর্শক এসেছিল আমায় দেখতে। তাদের কথোপকথন থেকে আমি জেনেছি একথা। ওরা খাঁচায় বাঁধা হিংস্র পশুর মতো আমায় দেখেছিল দূর থেকে। আমায় দেখিয়ে রক্ষী তাদের কাছ থেকে বকশিস্ পেয়েছিল—পাঁচটি মুদ্রা। তাকে তাই বেশ প্রফুল্ল মনে হয়েছিল সেদিন।

বল্‌তে ভুলে গেছি—দিবারাত্র একটি সান্ত্রী আমার 'সেল'-এর দরজায় পাহারা দেয়। যখন বাইরের দিকে তাকাই, তখন তার উৎসুক দৃষ্টির সঙ্গে হয় আমার দৃষ্টি-বিনিময়।···

তবু, সবাই মনে করে, এই পাথরের বাক্সের মধ্যে আলো-বাতাসের অভাব নেই।

[এগার]

দিনের আলোর প্রবেশাধিকার নেই এখানে।

এই চির-অন্ধকারের মধ্যে কি করতে পারি আমি ?

একটা ভাব এলো মনের মধ্যে।

আমি উঠ্‌লাম। আলোটি জ্বাললাম কক্ষের ভেতর—দেয়ালগুলো একবার পরীক্ষা করবো ভেবে।

দেয়ালের গায়ে কত রকমের লেখা, অদ্ভুত মূর্তি আর রাশি রাশি নাম—একটির ওপর একটি। তা' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—প্রত্যেকটি দণ্ডিত ব্যক্তি এখানে যে-কোন রকমের একটি স্মরণচিহ্ন রেখে যাবার চেষ্টা করেছিল সেগুলো পেন্সিল, খড়িমাটি, কিংবা কয়লা দিয়ে ধূসর, শাদা, কালো, অক্ষরে লেখা। কোনটি-বা পাথরের গায়ে খোদাই করা।

এলোমেলো ক'টি মর্‌চে-ধরা অক্ষর—যেন রক্তে লেখা। যদি স্বাধীন, মুক্ত থাকতো আমার মন, তা'হলে আমার চোখের সাম্‌নে কক্ষের প্রত্যেকটি পাথরের পাতায় পাতায় পুস্তকাকারে গ্রথিত অভিনব এই গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা কর্‌তে পারতাম—অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে···দেয়ালের গায়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবগুলোকে পারতাম মিলিয়ে নিতে...যারা সেগুলো লিখেছে তাদেরই মতো জীবন্ত, সজীব বাস্তব করে তুলতে পার্‌তাম—এই অসম্বন্ধ শব্দগাথাকে, ভাঙা বাক্যকে, বিকলাঙ্গ প্রস্তরলিপিকে -মস্তকহীন দেহগুলিকে...নামানুযায়ী প্রত্যেকটি লোকের পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়ে তুল্‌তাম।

আমার শিয়রের দিকে দেয়ালের উপরে আঁকা ছ'টি উন্নত

বক্ষ বাণবিদ্ধ।

তার উপর লেখা—"জীবনভর আমায় ভালবাস"। হতভাগার হয়তো বেশি সময় ছিল না।

একপাশে একরকম ত্রিকোণ টুপি।

তারই নিচে কাঁচা হাতে আঁকা একটি মূর্তি। তা'তে লেখা —সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন্। ১৮২৪ সাল।

আর এক যায়গায় রয়েছে খোদাই করা—আমি ভালবাসি, আমি পূজা করি—"বী"-কে

অপরদিকের দেয়ালে লেখা একটি নাম—পাপাভইন্। 'প' অক্ষরটি আকারে একটু বড়, কারুকার্য-খচিত।

একটি বিশ্রী গানের তুটো লাইন!

একখানি জাতীয় পতাকা নিপুণভাবে খোদাই করা। নিচে লেখা—স্বাধীনতা—গণতন্ত্র!

হতভাগ্য যুবক!

কল্পিত রাজনীতির মত কত ভীষণ!

একটি ভাব, একটি স্বপ্ন—একটি চিন্তা। এই ভীষণ বাস্তবতার জন্য প্রাণদণ্ড।

এখানেই আমার অভিযোগ।

তুর্ভাগা আমি—অপরাধ করেছি—রক্তপাত করেছি!

কি দেখলাম!

না, আমি আর অনুসন্ধান করতে যাবো না।

দেয়ালের এককোণে দেখেছি—ভীষণ একটি ছবি।

—মশান-মঞ্চের চিত্র। ফাঁসিমঞ্চ—যা' হয়তো এখন থেকে

তৈরী হচ্ছে আমারই জন্য।

আলোকটি খসে পড়লো আমার কম্পমান হাত থেকে।

[বারো]

তৃণশয্যায় বসে আছি হাঁটুর ভেতর মাথাটি রেখে।

একটু পরেই কেটে গেল মনের অহেতুক ভয়। দেয়ালের গায়ের লেখাগুলো পড়তে লাগলাম আবার—কৌতূহলী হয়ে।

পাপাভাইন...

এই নামের পাশ থেকে একখানি মাকড়সার জাল সরিয়ে ধূলো ঝেড়ে দেখলাম—তারই নিচে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ক'টি নাম...

ডটন, ১৮২৫, পলেন, ১৮১৮, জিন্ মার্টিন, ১৮২১, কাস্-টাইঙ্গ, ১৮২৩।

নামগুলো পড়ে অপ্রসন্ন শোকের ভাব পুঞ্জিত হয়ে উঠলো মনে।...

ডটন...সে তার ভাইকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তার দেহটি নর্দমায় আর শিরটি ঝরণার মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল প্যারীতে।

পলেন...সে হত্যা করেছিল তার পত্নীকে।

জিন্ মার্টিন...রিভলভারের গুলিতে ঘটিয়েছিল তার বৃদ্ধ পিতার জীবনান্ত।

আর কাস্‌টাইঙ্গ...সে ছিল ডাক্তার। তার এক বন্ধুকে হত্যা করেছিল বিষপ্রয়োগে। বন্ধুর অসুখে সে ঔষধের বদলে

দিয়েছিল বিষ, অধিকিন্তু বদ্ধ পাগল কাস্‌টাইঙ্গ শাণিত ছুরিকা-ঘাতে নিজের শিশুদের করেছিল শিরশ্চেদ।

আমার কটিদেশ কেঁপে উঠলো জ্বরাক্রান্তের মতো। এরা... এই কক্ষে এরাই এসেছিল আমার আগে। মেঝের যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি, সেখানে তারা—এই হত্যাকারীরা দাঁড়িয়ে করেছিল তাদের শেষ চিন্তা।

একজনের পর এসেছে আর একজন।

কোনদিনই হয়তো খালি থাকেনা এই সেলখানি। যায়গাটি এখনও তাদের নিশ্বাসে তপ্ত। তারা যেন তাদের শেষ নিশ্বাস-টুকু রেখে গেছে আমারই জন্য। পাপাচারীদের কবরভূমিতে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ''ক্রেমাটের'' শ্মশানভূমিতে তাদেরই সঙ্গে হবে আমারও স্থান!

উদ্ভট কল্পনা বা অন্ধ বিশ্বাস নেই আমার! চিন্তায় আমার শরীর উত্তপ্ত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল—এ সব হিংস্র প্রকৃতির লোকগুলোর নাম একটি কালো দেয়ালের ওপর মুদ্রিত রয়েছে আগুনের অক্ষরে।

ক্রমস্পষ্টমান কোলাহল আমার কানে বাজ্‌লো। চোখের সামনে একটি লাল আলো জ্বলছে যেন। কারাকক্ষটিতে যেন আমার অপরিচিত, কত সব বিকটাকৃতি লোক এসে হয়েছে জড়। তাদের বাম হাতে রয়েছে নিজের নিজের ছিন্নমুণ্ড। মুণ্ডগুলো কেশহীন, তাই ওরা মুখের ভেতর হাত দিয়ে সেগুলো ধরে রেখেছে। শুধু সেই পিতৃহন্তা ছাড়া আর সবাই আমাকে ঘুসি দেখাচ্ছে। তার ডানহাতখানি ছিল কাটা, তাই সে তা' পারেনি।

ভয়ে চোখ বুজ্‌লাম আমি। সব স্পষ্ট—আরো স্পষ্টবোধ হলো। স্বপ্ন, কল্পনা বা সত্য—যাই হোক্ না কেন—যদি এমন সময় একটা অভাবনীয় ঘটনা আমায় আকৃষ্ট না করতো, তা'হলে বোধ হয় আমি পাগল হয়ে যেতাম।

প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম—আমার গা বেয়ে লোমশ পা আর ঠাণ্ডা দেহ-ওয়ালা একটা জিনিস যেন উঠ্‌ছে—হঠাৎ দেখি আমার উপদ্রবে একটি মাকড়সা পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতিস্থ হলাম।

অপচ্ছায়া! না ছায়ামূর্তি! আমার চিন্তাগ্রস্ত মনের ভ্রান্তি, ম্যাক্‌বেথের মতিভ্রম।

যারা মরেছে তারা চিরদিনের জন্যই গেছে। কবরের কারাগার থেকে তারা কি উঠে আসতে পারে?

ভেতর থেকে চিতার দরজা খুলে যেতে পারেনা—পারেনা।

[তেরো]

গত ক'দিন ধরে আমি একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখ্‌ছি। দিন তখনও হয়নি।

কারাগার কোলাহলমুখর। শুন্‌ছি—ভারী দরজাগুলো খোলা আর বাঁধার শব্দ, লোহার কড়ি ঘর্ষণের আওয়াজ, কোমরে ঝুলানো চাবির ঝনঝনানি।

সিঁড়িগুলো ক্রমাগত অবিশ্রান্ত পদক্ষেপে মচ্‌ মচ্‌ করে উঠছিল। বারান্দার একপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন আর একপ্রান্ত থেকে

উত্তর দেওয়া শোনা যাচ্ছিল।

সেল-এ আবদ্ধ, কারাদণ্ডে দণ্ডিত আমার প্রতিবেশীরা ছিল অস্বাভাবিক আনন্দিত। জেলপ্রাসাদখানি যেন হাস্‌ছে—গাইছে, দৌড়ছে, নাচছে।

এই গোলমালের মধ্যে শুধু আমিই একা—নীরব, স্থির। অবাক হ'য়ে শুন্‌ছিলাম।

একজন জেলার যাচ্ছিলেন। সাহস করে তাঁকে ডেকে জিগ্যেস করলাম,—আজ জেলে কি কোন উৎসব আছে?

উৎসব, তা তুমি বলতে পার! যে-সব কয়েদীকে কাল 'টোলনে' স্থানান্তরিত করা হবে, আজ তাদের বেড়ি পরানো হচ্ছে দেখবে, তুমি? তা'তে বেশ কিছুটা আমোদ পাবে।

নির্জন নিঃসঙ্গের পক্ষে নিতান্ত ঘৃণ্য যে-কোন রকমের একটি দৃশ্য উপভোগ করবার আমন্ত্রণও সৌভাগ্যের বিষয়। সানন্দে গ্রহণ করলাম এই নিমন্ত্রণ।

স্বাভাবিক সতর্কতার সঙ্গে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন—আসবাবপত্রহীন একখানি খালি সেল-এ। সেল-এ হুড়কা দেওয়া একটি জানালা।

একটু উঁচুতে আরেকটি ছিদ্রপথ। তারই ভেতর দিয়ে আকাশখানি দেখা যায়।

তিনি বললেন, এখান থেকে তুমি সব দেখতে পাবে—শুন্‌বেও। এই খালি বাকস্‌টার ওপর তুমি একা, একেশ্বর বসে থাক।

বেরিয়ে গেলেন তিনি—অর্গল এঁটে, শিকলের ওপর তালা লাগিয়ে।

জানালাখানির চারদিকে দেয়ালের মত একখানি ছ'তালা প্রস্তরপ্রাসাদ। প্রাসাদে একখানি প্রাঙ্গণ।

চতুষ্পার্শ্বস্থ হর্ম্যের মুখে অগণিত হুড়কা দেওয়া জানালা। জানালার উপর এক একখানি মলিন, শুষ্ক মুখ ঝুঁকে পড়েছে —যেন দেয়ালে একটির উপর একটি পাথর— সবাই যেন লোহার জালের সঙ্গে আঁটা। এর থেকে দুঃখপূর্ণ, এর চেয়ে স্পষ্ট কি আর থাক্‌তে পারে ?

তারা সবাই বন্দী, এই উৎসবের দর্শক—তারপর তারাও যোগ দেবে অভিনয়ে। নরকের মুখে ছিদ্রপথে আত্মা। তারা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের শোকাকুল অন্ধকার মুখগুলোর মধ্যে আগুনের ফুলকির মতো ক'টি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ।

কারাপ্রাচীর তাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করতে পারেনি। প্রাসাদের পূর্বদিকটা দ্বিধা বিভক্ত—পাশের অংশের সঙ্গে জাফ্‌রি দিয়ে সংযুক্ত। মূল প্রাঙ্গনটির চারদিকে দেয়ালে আঁটা পাথরের বেঞ্চি। মাঝখানে ল্যাম্প রাখবার একটি জায়গা।

মধ্যাহ্ন।······

একটি বড় দরজা খুলে গেল।

নীল পোষাক-পরা হতভাগ্য ঘর্মাক্ত-কলেবরে সৈন্যগণ একখানি টানা গাড়ি ধীরে ধীরে উঠানে আন্‌লো। এটি শিকল আঁটা দণ্ডিতদের গাড়ি।

ঠিক সেই মুহূর্তে—কারাগারে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হলো। দরজার কাছে নীরবে দণ্ডায়মান স্থির দর্শকেরা চিৎকার

করে আনন্দ প্রকাশ করলো, কয়েদীদের অভিশাপ দিল।

ঘরখানিতে যেন চলেছে দানবের অভিনয়। প্রত্যেকটির মুখ বিকৃতভাবে স্মিত। হাতগুলো ছিল লৌহদণ্ডের ভেতর নিক্ষিপ্ত। তারা সবাই চীৎকার করলো, চোখগুলো উঠলো জ্বলে। অঙ্গারের মধ্যে এতগুলো আগুনের ফুল্‌কি দেখে আমি ভয়ে হতাস হয়ে পড়েছিলাম।

ইতিমধ্যে সার্জেণ্টরা তাদের কাজ স্বুরু করলো। পোষাক তাদের পরিষ্কার, মনে শঙ্কা। একজন রক্ষী গাড়িতে চড়লো আর তার সহযোগী শিকল, কোমর-বন্ধ আর পা-জামার তাড়া ছুঁড়ে দিল। তারপর ভাগ করে দেওয়া হোল তাদের কাজ। তাদের উঠানের এক কোণে লম্বা শিকল—সেগুলোকে তারা বলতো সিঙ্কের ফিতা—বিছিয়ে রাখলো। আর একদল শার্ট, পাজামাগুলো শুকাতে দিল। ক্যাপ্টেন সাহেব লোহার বেড়িগুলো পাথরে আঘাত করে বাজিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলো।

যাদের জন্য এই আয়োজন সেই কয়েদীদের উচ্চ হাসির রোল আর বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে চলেছিল এ-সব কাজ।

আয়োজন শেষ হলে হাতে রূপালি ফিতা মোড়ানো একটি লোক ইনস্‌পেক্টারকে ডাক্‌লেন। এক মুহূর্ত পরে তিনটি নিচু দরজা ঝড়ের গতিতে ফুৎকারে খুলে গেল। অনেকগুলো ভীষণাকার লোক উঠানে বেরিয়ে এলো একসঙ্গে। তারা সবাই কয়েদী।

সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে দ্বিগুণ উল্লাসধ্বনি শোনা গেল।

তাদের মধ্যে যারা একটু সর্দার গোছের, তারা গর্ব-মিশ্রিত বিনয়ের সঙ্গে তাদের সহযোগীদের এই আনন্দ আর ধন্যবাদ গ্রহণ করলো। তাদের অনেকেরই মাথায় ছিল সেল-এর খড় দিয়ে তৈরী এক অদ্ভুত ধরণের টুপি।

শহরের বুকের উপর দিয়ে তারা যখন যাবে, তখন তাদের দেখেই চেনা যাবে। তারাই পাবে বেশি বাহবা।

একটি কয়েদীকে দেখে অত্যন্ত উৎসাহিত হলো সবাই। সতের বছরের যুবক সে। তরুণীর মুখের মতো সুষমাময় তার মুখখানি। একটি সপ্তাহ ধরে সে ছিল সেল-এ আটক। আজ সে বেড়িয়েছে। খড় দিয়ে সে তৈরী করেছে একটি পোষাক। আপাদমস্তক সেই পোষাকে আবৃত করে বিসর্পিল চঞ্চল গতিতে সে নেমে এলো উঠানে। সেই পরিহাস রসিক ছোক্‌রা চৌর্যাপরাধে দণ্ডিত হয়েছে। অবিশ্রান্ত করতালি আর আনন্দ-ধ্বনিতে উঠলো একটা কোলাহল।

সে এক ভীষণ রোমাঞ্চকর দৃশ্য! দণ্ডিত আর কারারুদ্ধের জীবনে এলো আমোদ-উল্লাস। দর্শকদের মধ্যে ছিল জেলার আর কৌতূহলী লোকগুলো। এ দৃশ্য তারা উপভোগ করছিল বেশ।

অপরাধ অগ্রাহ্য হয়ে গেছে, ভয়ঙ্কর শাস্তি আজ পরিণত হয়েছে ঘরোয়া আমোদে।

ছ'ধারে সারি বেঁধে দাঁড়ানো জেলার আর জেল কর্ম-চারীদের ভেতর দিয়ে তাদের নেওয়া হলো। ডাক্তারেরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। এখানেই তারা তাদের শরীর খারাপ, চোখের অসুখ, হাত-পা ভাঙা

ইত্যাদি অজুহাতে এ যাত্রা রক্ষা পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায়ই তাদের 'উপযুক্ত' ছাপ মেরে দেওয়া হয় আর তারা নিজের জীবনের অপটুতার কথা ভুলে গিয়ে নীরবে চায় অদৃষ্টকে বরণ করে নিতে।

লোহার দরজা গেল খুলে।

রক্ষী বর্ণানুক্রমে নাম ডাকতে লাগলো। কয়েদীরা বেরিয়ে এলো একে একে। বড় উঠানের এক কোণে দাঁড়ালো সবাই সারি বেঁধে, প্রত্যেকটি লোক—একা, আর একজন অপরিচিতের পাশে।

যদি দৈবাৎ কোন কয়েদীর সঙ্গে তার বন্ধুর মিলন হয়, লোহার শিকল তাদের দুঃখের সমভাগী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে দেয় যেন।

জন তিরিশ লোক এলো বেরিয়ে। বন্ধ করা হলো লোহার দরজাখানি। রক্ষী সারি বেঁধে দাঁড়ানো প্রত্যেকটি কয়েদীকে ছুঁড়ে দিল—এক একটি পাজামা আর শার্ট। তারপর তার আদেশে গায়ের পোষাক খুলে ফেললো সবাই।

একটি অভাবনীয় ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ-গর্বকে উৎপীড়নে পরিণত করলো। সেই সময়টুকু পর্যন্ত আবহাওয়া ছিল বেশ। হেমন্তের বাতাসে চারদিক ছিল শীতল। মাঝে মাঝে ধূসর মেঘের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল সূর্য। দণ্ডিতেরা জেলের পোষাক খুলে একজনের পেছনে আর একজন দাঁড়ালো লাইন বেঁধে—যেন কর্তৃপক্ষ তাদের সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করতে পারে।

হঠাৎ বাতাস ছুটলো বেগে। বৃষ্টি এলো মুষল ধারে,

তাদের সর্বাঙ্গ গেল ভিজে। রক্ষী আর দণ্ডিতেরা ছাড়া আর সবাই প্রাঙ্গণ ছেড়ে পালালো।

তখনও বৃষ্টি পড়ছে অজস্রধারায়। তারই ভেতর দাঁড়িয়ে অর্ধনগ্ন কয়েদী আর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অবিরাম জলস্রোত ছাড়া আর কিছুই পড়েনা চোখে।

কলরব থেমে আসে। তারা কাঁপতে লাগলো, দাঁত কড়্ কড়্ করছে, লোমশ হাঁটু করতে লাগলো ঠক্ ঠক্। তাদের গায়ে বৃষ্টিসিক্ত শার্ট আর পাজামাগুলো দেখে সত্যসত্যই কষ্ট হচ্ছিল মনে।

উলঙ্গ অবস্থাই ছিল ভালো। একটি বুড়োর গায়ে শার্ট ছিল না। সে তার ভিজা শার্টটা দিয়ে গা মুছতে মুছতে চীৎকার করে উঠলো—এটি তো আমাদের কাজেব তালিকার মধ্যে ছিল না।

আকাশের দিকে হাত তুলে হাসতে লাগলো সে। কিন্তু রক্ষীরা সে দিকে দৃষ্টিপাতও করলো না।

ভ্রমণের পোষাক পরা হলে বিশ তিরিশ জন করে তাদের নেওয়া হলো উঠানের আর এক কোণে, সেখানে তাদের জন্য ছিল শিকল প্রস্তুত। শিকলগুলো যখন মাটিতে বিছিয়ে রাখা হয়, তখন সেগুলোকে মাছের কাঁটার মতো দেখায়।

কয়েদীরা বসলো কাদার উপর। হাঁসুলিগুলো পরানো হলো তাদের গলায়। দু'জন কামার এসে হাল্‌কা নেহাইয়ের সাহায্যে সেগুলো শক্ত করে এঁটে দিল, লোহার পেরেকের উপর সজোরে আঘাত দিয়ে। এ অবস্থা দেখে অতি কঠিন লোকের

হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় করুণায়। নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির প্রত্যেকটি আঘাতে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল তাদের চিবুক। সামনে বা পেছনে একটু নড়লেই যেন তাদের মাথার খুলি যাবে ভেঙে— সুপারীর খোলের মতো।

এরপর কয়েদীরা হয়ে গেল গম্ভীর, চারিদিক নিস্তব্ধ। শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ আর মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট ধ্বনি, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদকারী কয়েদীর পায়ের উপর রক্ষীর লাঠির আঘাতের শব্দ যাচ্ছিল শোনা।

কেউ বা ব্যাথার যাতনায় কাঁদছিল। আবার যারা একটু বয়স্ক তাদের দেহ আর ওষ্ঠাধর কাঁপছিল রাগে।

লোহার কাঠামোয় এ-সব কুটিল একরোখা ছবি দেখছিলাম —পাষাণ মূর্তির মতো স্থির, নিশ্চল হয়ে।

ডাক্তারের পরীক্ষার পর রক্ষীদের পরীক্ষা। তারপর হাঁসুলি পরানো। একটি অঙ্কের তিনটি দৃশ্য।

ম্রিয়মান সূর্যালোক দেখা গেল আবার। সেই আলোকে আগুনের তাপ। সব যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কয়েদীরা দাঁড়ালো যুগপৎ। একত্র করা হলো পাঁচটি শিকল। বাতি-দানের চারপাশে একটা বিশাল চক্রমণ্ডল তৈরি করলো সেগুলো। জুরীরা তুললেন তাঁদের শ্রান্ত চোখ। কয়েদীরা গাইলো একটি প্রেমের গান—গ্রাম্য ভাষায়, বেশ স্পষ্টভাবে, পরম আনন্দভরে।

মাঝে মাঝে কর্কশ উচ্চ ধ্বনি, বিকট হাসি; তারই সঙ্গে দুর্বোধ ভাষায়, —বাহবা। শিকলের আওয়াজের থেকে কর্কশ

তাদের গান, তাদের নাচ—যেন পিশাচ নৃত্য, অবিকল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী !···

একটি বড় গামলা আনা হলো উঠানে। রক্ষা লাঠির আঘাতে তাদের নাচ-গান থামিয়ে নিয়ে এলো গামলার কাছে। কি একটা তরকারী সেটাই যেন দেখা যাচ্ছিলো ! জানিনা সেই ধূমায়মান তরল পদার্থ টা কী।

খাওয়া শেষ হলো তাদের।

কালো রুটি আর তরকারীর ভুক্তাবশিষ্ট-টুকু মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার সুরু করলো নাচ-গান। এখান থেকে চলে যাবার আগের দিন আর পরের দিন রাত্রিতে তাদের এমনি-তরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলাম—উৎসুকভাবে। নিজের ক্লেশের কথা একেবারেই গিয়েছিলাম ভুলে। তাদের জন্য আমার মনে জেগেছিল—সহানুভূতি আর বেদনা। আমার কান্না এলো তাদের হাসির শব্দে···

মনখানি ভরে আছে গভীর চিন্তার সমুদ্রে। দেখলাম—চক্র ভেঙে গেছে, তারা সব নীরব। ওরা তাকালো আমার জানালার দিকে। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলে উঠ্লো—ঐ···ঐ যে একজন দণ্ডিত অপরাধী !

দ্বিগুণ বাড়লো তাদের হাসি আর আনন্দধ্বনি। জানিনা তারা কেমন করে জানলো আমার পরিচয়। পাথরের মতো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারা হাসির সঙ্গে আমায় জানালো অভিনন্দন... সুপ্রভাত, সুরাত্রি—নমস্কার—

সেলাম !

একজন অল্পবয়স্ক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী আমার উপর ঈর্ষাপরায়ণ হয়েই বললো, তুমি ভাগ্যবান্। এ দূষিত নিশ্বাস তোমাকে আর গ্রহণ করতে হবে না বেশীক্ষণ। নমস্কার হে …বন্ধু।

মনে পড়ছে না—আমার মনে কি ভাব খেলচ্ছিল তখন।

সত্যই, আমি তাদেরই সাথী। ফাঁসি কারাগারেরই সহোদর।…না ?

আমি তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের। তবু তারা আমায় সম্মান দেখাচ্ছে দেখে, অন্তরাত্মা গেল শুকিয়ে, থর থর করে কাঁপতে লাগলাম

হ্যাঁ, তাদের বন্ধু বটে ! ক'দিন পরে ওদের কেউ কেউ আমায়ও হয়তো দেখবে এমনিভাবে।

দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম—স্থির, হতভম্ব—শক্তিহীন !

শিকলখানি এগিয়ে চললো—দানবের আগ্রহে। আমার কানে বাজলো তার ঝন্ ঝন্ শব্দ, কয়েদীর চীৎকার আর পদধ্বনি। মনে হলো—একদল দানবসৈন্য প্রচণ্ড উল্লাসে আমার নির্জন সেল-এ প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। চীৎকার করে উঠলাম…জোরে করাঘাত ক'রে চেষ্টা করলাম দরজা খুলতে। কিন্তু উপায় ছিল না পালাবার।

দরজা বাহির থেকে বন্ধ।

একটা নিস্ফল সংগ্রাম করলাম, উন্মত্ত ক্রোধে করলাম

ডাকাডাকি।

কয়েদীদের বিকট কোলাহল যেন স্পষ্টতর নিকটতর হয়ে আসছে!

ঐ—ঐ তাদের ভীষণাকৃতি শিরগুলো আমার জানালার শিকের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

আতঙ্কে চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম···

[চোদ্দ]

যখন সংজ্ঞা হোল তখন রাত হয়েছে।

রোগীর বিছানায় শুয়ে ছিলাম আমি। মাথার উপরে টানানো দোদুল্যমান প্রদীপের আলোকে দেখলাম—আমার উভয় পার্শ্বে রয়েছে পীড়িতদের বিছানা—সারি সারি।

বুঝতে পারলাম—আমি হাসপাতালে।

আগের সেই ভাব বা পূর্বস্মৃতি নেই আমাব মনে। আছে শুধু শয্যাত্রিতের আরাম।

হাসপাতালের এই শয্যা আর এই কারাগৃহ আগে আমার মনে আনতো দুঃখ ও বিরক্তি, কিন্তু আজ আমি আর তেমনটি নেই!

জানিনা, জনতার মধ্যে এই মালগাড়িতে যারা চড়েছিল তাদের মধ্যে কি কথোপকথন হচ্ছিল। একদিকে অপমান, আর একদিকে দম্ভ আর উভয়দিকে অভিসম্পাত!

কাপ্তানের আদেশে লাঠিচালনা করা হলো—বেপরোয়াভাবে। কয়েদীরা আঘাত পেলো—মাথায়, গায়ে।

তারপর সবাই শান্ত নীরব হয়ে গেল আবার। তাদের চোখে প্রতিহিংসার ছাপ। হায় রে অভাগার দল!

তাদের ক'জন রাগে হাঁটু চাপড়াচ্ছিল। শার্দুলের খাঁচা ভাঙবার বিক্রম কোথায়?

পাঁচ খানি মাল গাড়ী অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে কারাগারের দ্বার অতিক্রম করলো। তার পেছনের গাড়ীতে বোঝাই করা হয়েছিল আসবাবপত্র, শিকল!

জনকয়েক রক্ষী পেছনে পড়েছিল। তারাও দৌড়ে এসে জুটলো দলে।

জনতা ভেঙে গেল।

ঐন্দ্রজালিক আলোকের মতো সবই অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। গাড়িগুলো যতই অগ্রসর হচ্ছে চলার ঘড়ঘড়ানি ততই হয়ে আসছে অস্পষ্ট, ক্ষীণতর হচ্ছে চাবুকের শব্দ, শিকলের ঝন ঝন আওয়াজ, আর কৌতূহলী জনতার হর্ষধ্বনি।

এই তাদের সুরু···

কী বলেছিলেন কৌশলীরা?

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

মৃত্যু এর চেয়ে ঢের ভালো। ফাঁসিরমঞ্চ কারাগারের চেয়ে অধিক আরামের। জীবনভর গলায় হাঁসুলী পরার চেয়ে একেবারে ফাঁসির দড়ি পরাই-তো ভালো।

কারাগার—! কঠোর হাড়ভাঙা পরিশ্রম, নির্যাতন!!

[পনের]

দুর্ভাগ্যের বিষয়, অসুস্থ হইনি আমি।

তাই পরের দিনই হাসপাতাল ছেড়ে সেল-এ ফিরে যেতে বাধ্য হলাম।

আমি পীড়িত নই ?

সতিই তো। আমি যুবক, স্বাস্থবান, শক্তিমান। আমার ধমনীতে স্বাধীনভাবে বয়ে যায়—তপ্ত রক্তস্রোত, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহায়তা করে ইচ্ছা প্রূরনের। বলিষ্ঠ আমার শরীর, সুষ্ঠু আমার মন, বাঁচবার—দীর্ঘদিন বাঁচবার সাধ আমার মনে রয়েছে ষোল আনা। তবু আমি পীড়িত—কঠিন রোগগ্রস্ত ; আর সে রোগ দিয়েছে—মানুষ।

বিছানার ধূসর, কর্কশ, সুজনিটি পাতলা, ছেড়া। তোষকের নিচের খড়গুলো পায় বিঁধছিল। তবু আরামের সঙ্গে ইচ্ছামত গা-টানা দিতে পারছিলাম। পাতলা সুজনির নিচে থেকে যে কন্‌কনে শীত অনুভব করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, সেই শীত যখন কমে গেল তখন ঘুমে এলিয়ে পড়লো আমার দু'টি চোখ।

একটা গোলমাল শুনে জেগে উঠ্‌লাম।

তখন প্রভাত হয়েছে। বাইরের কর্ম কোলাহল আসছিল ভেসে। জানালার পাশেই আমার বিছানা। কৌতূহলী হয়ে জানালা দিয়ে গলা বাড়ালাম।

প্রাঙ্গণখানি দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে।

দেখলাম—প্রাঙ্গণটি জনাকীর্ণ, একটি প্রবীণ সিপাহী ছোট

রাস্তাটি অতি কষ্টে আগলে আছে। তার মধ্য দিয়ে পাঁচটা লম্বা গাড়ি এলো ধীরে ধীরে। গাড়িগুলো লোকে ভর্তি। কয়েদীরা ঐ গাড়িতেই যাবে।

গাড়িগুলো খোলা। শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল গাড়িগুলো। কয়েদীরা সামনাসামনি, পাশাপাশি বসেছিল। গুলিভরা বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল রক্ষী। শিকলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গাড়িটি চলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের মাথা নড়ছিল, পা ঝুলছিল, দুলছিল সর্বশরীর।

বাদল দিনের বাতাস ছিল সিক্ত। ভিজা পাজামাগুলো কয়েদীদের হাঁটুর সঙ্গে আছে লেগে। তাদের লম্বা দাড়ি, ছোট চুল জলে ভিজা, মুখ পাণ্ডুর। তাদের গা কাঁপছে শীতে, দাঁত নড়ছে,—রাগে আর ঠাণ্ডায়।

মুক্তিলাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। শিকলে একবার বাঁধা পড়লে আর উপায় নেই ছাড়া পাবার। তারা যেন শিকলের সঙ্গে এক হয়ে আছে—শিকলটি যেন তাদের কাছে একটি মানুষ!

মনখানি তখন যায় হারিয়ে, কারা-বন্ধন ঘটায় মনের অপমৃত্যু।

পশুর মতো নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি ছাড়া আর কোন কিছুই যেন থাকেনা তখন।

এম্‌নি অর্ধনগ্ন বন্ধ অবস্থায়, অনাবৃত-মস্তক, শিক্ত দেহ এই হতভাগ্যেরা পঁচিশ দিনের পথে বেরিয়ে পড়লো।

এ অবস্থায়ই মানুষ ভগবানকে জল্লাদের বেশে কামনা করে

সাহায্যের জন্য।

হাসপাতাল থেকে আসার পর মনখানি হয়েছে ভয়ঙ্কর চিন্তাগ্রস্ত। উন্মাদ হয়েছি সেই চিন্তায়—

—যদি ওরা আমায় সেখানে রাখতো, হয়তো আমি পালাতে পারতাম।

ডাক্তার আর নার্সরা আমায় যেন একটু সুনজরে দেখেছিল, এত অল্প বয়সে এমনি করে মরা, বোধ হয় আমার উপর তাদের দয়াও হয়েছিল। গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে তারা বসতো আমার বিছানার চারিদিকে। তারা বিনয়ে বাধা দিতো আমায়।

বাঃ! ওটা ছিল ঔৎসুক্য।

এরা মানুষকে রোগ মুক্ত করতে পারে, কিন্তু তাদের মৃত্যু-দণ্ড থেকে পারে না অব্যাহতি দিতে। তবু তাদের পক্ষে সহজ এ কাজ।

এখন আমার কোন আশা নেই। আমার আপীল অগ্রাহ্য হলেও পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। সাক্ষ্য প্রমাণের কোন ত্রুটী হয় নি। আমার কৌসুলী যথাসম্ভব যোগ্যতাব সঙ্গে সওয়াল-জবাব করেছেন, বিচারকেরা সতর্কতার সঙ্গে ন্যায় দণ্ড বিধানই করেছেন।

না—না—, এ উন্মাদনা···কোন আশা নেই।

আপীল!

আপীল শুধু দণ্ডিতকে তুলে রাখে একটা গভীর গহ্বরের উপর। সত্যিসত্যিই না-ভাঙা পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে মনে হয় —আভরণ খসে পড়লো বুঝি! ছ-সপ্তাহ, সত্যিই ফাঁসির

দড়িখানি গলার উপর এসে পড়ারই মতো।

যদি আমায় ক্ষমা করা হয়?

ক্ষমা! কে করবে ক্ষমা? কিসের জন্য? কেমন করে? ওরা কিছুতেই আমায় ক্ষমা করবে না। ওরা বলে, একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। আমিই হবো তাঁদের ভবিষ্যতের উদাহরণ।

শুধু তিন পা আমি যেতে পারি—বারান্দায়—ভেতরের আর বাইরের কামরায়।

[ষোল]

হাসপাতালে জানালার কাছে ক'ঘণ্টা সূর্যের আলোয় বসেছিলাম।

সে সময়টুকু লোহার শিকের কাছ দিয়ে আসা সবটুকু রশ্মি উপভোগ করেছিলাম, শক্তি হীনের মতো চেয়ারে বসে।

কারাগারের উগ্র আবহাওয়া তিক্ত করেছিল আমায়। কানের কাছে বাজছিল—কয়েদীদের হাতে পায়ে বাঁধার শব্দ। শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম একঘেয়ে কারা-জীবনে। ভগবান যদি দয়া করে একটি পাখিও পাঠাতেন যে আমায় ছাতের উপর বসে গান শেখাতে পারতো!

জানি না আমার প্রার্থনা কার কানে গেল —ভগবানের না শয়তানের।

জানালার নীচে একটি শব্দ শুনলাম।

এ তো পাখীর গান নয়। তার চেয়ে অনেক মিষ্টি। পনেরো

বছরের তরুণীর মধুর কণ্ঠের গান! মাথা তুলে তার গান শুনতে লাগলাম—উৎসুক হয়ে। একটি বিষাদের অবসাদের সুর।

আশায় ধ্বনিত হলো নিরাশার রাগিনী! গান চললো অনেকক্ষণ ধরে, একই সুরে…

অর্দ্ধস্ফুট সেই কান্নার অর্থ হচ্ছে—এক তরুণী, আশায় ভরা ছিল তার অন্তরখানি, তার প্রণয়ীকে পাবার জন্য একটি লোককে হত্যা করেছিল। জীবন দিয়ে সে পেতে চেয়েছিল একটি জীবন। কিন্তু তাকে পাবার সুযোগ আসার আগেই সে নিতে বসেছে বিদায়…

এই কাহিনী অতি করুণ অথচ বৈচিত্রহীন সুরে হলো গাওয়া—বার বার।

হতাশ স্থির বেদনাকুল হয়ে পড়লাম। গোলাপের মতো রাঙ্গা ঠোঁট দিয়ে ধুয়ায় আসা এ কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এ যেন গোলাপের পাপড়ির উপর শামুকের ক্লেদ।

ভেবে পেলাম না—কেমন করে মনের সে ভাব প্রকাশ করবো। আহত হলাম মনে, আনন্দও যে জাগল না এমন নয়।

তরুণীটির মুখের রক্তলোলুপ ইতর ভাষা, শিশু ও নারীর শোচিত সুর, তার প্রত্যেকটি কথা, তার দেহ ভঙ্গিমা একেবারে দোষলেশ স্পর্শহীন।

কারাগার!

কি জঘন্য এ স্থান। সব কিছুই জর্জর হয়ে পড়ে তার বিষে। সবই বিনষ্ট হয়—তার স্পর্শে, এমন কি তরুণীর কণ্ঠের গানও। এখানে কর্দমাক্ত হয় পাখীর পালক, সুগন্ধি ফুলও ছড়ায় বিষ।

[সতেরো]

যদি পালাতে পারি!

মাঠের উপর দিয়ে ছুটবো! না, ছুটব না···তাতে সন্দেহ হবে লোকের।

স্বাভাবিক ভাবে মাথা তুলে ধীরে ধীরে গাইতে গাইতে চল্‌বো।

একটা ছদ্মবেশ ধরবো! যোগাড় করবো এখানকার লোকের একটি পোষাক।

পাহাড়তলীর অদূরে—সেই জলাভূমির পাশে রয়েছে একটি ঝোপ। ছেলেবেলায় যেখানে মাছ ধরতে যেতাম, সেখানে লুকিয়ে থাকবো।

তারপর রাতের আঁধারে শুরু করবো পথ চলা। সোজা চলে যাবো। না—সে পথে পড়বে পাহাড়, বন।

পেছন দিকে?

সে দিকে যে নদী!

নিরুপায় আমি।

হতভাগ্য কাল্পনিক! আগে উলঙ্ঘন কর কারা প্রাচীর। তারপর স্থির করো গন্তব্য স্থান।

মৃত্যু! অনিবার্য মৃত্যু!

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম এখানে—এখানকার নদী, পাহাড় আর লোকজন দেখতে।

সেদিন আর আজ!

স্বাধীনতা আর বন্ধন। যেন এক দুস্তর উত্তাল সমুদ্রের এপার-ওপার!

[আঠারো]

···লিখছিলাম।

আমার প্রদীপের আলো ম্লান হয়ে গেল। দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো আমার সেলখানি।

গির্জার ঘড়িতে ছ'টা বাজলো।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটলো তার মানে কি?

রক্ষী এলো আমার কারাকক্ষে। তার টুপীটা তুলে, আমায় বিরক্ত করতে এসেছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, জিজ্ঞেস করলো যতদূর সম্ভব মিষ্টি সুরে—আমি কি খাবো সকাল বেলা?

বুকখানি কেঁপে উঠলো দুরু দুরু করে—

তবে—তবে কি আজই—?

[উনিশ]

মনে হয়, আজই।

জেলের অধ্যক্ষ আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে নিজে। জিজ্ঞাসা করেছেন—আমার সন্তুষ্টির জন্য তিনি কি করতে

পারেন, জানতে চেয়েছেন—তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ আছে কি না, সৌজন্যের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন—আমার শরীর কেমন, রাতটি কেমন কেটেছে।

যাবার সময় তিনি আমায় 'মশাই' বলে সম্বোধন করেছেন আজ।

উঃ, আজ নিশ্চয়ই—!

[কুড়ি]

কারাধ্যক্ষ একরকম নিশ্চিত—তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর সহকারীদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তাঁর এ ধারণা সত্য।

অভিযোগ্ করা আমার পক্ষে হবে অন্যায়। তারা তাদের কর্তব্য করেছে যথারীতি, আমার যত্ন করেছে, তা' ছাড়া আমার আসার দিন আর আজ যাবার দিনে ভদ্র ব্যবহার করেছে, করছে।

তাদের উপর সন্তুষ্ট না থাকার কোন কারণ নেই। সদা হাস্য মুখ, মিষ্টভাষী, উৎসুক, সদয়দৃষ্টি, দীর্ঘাকৃতি 'জেলার' যেন কারাগারের অবতার, মূর্তিমান বিগ্রহ। কারা—আমার চারদিকে কারা। মানুষের মধ্যে জাফ্রি বা লোহশলাকার মধ্যে আমি কারা দেখতে পাই। প্রাচীর—পাথরের কারা, দরজা—কাঠের বন্দীশালা, আর রক্ষীরা যে অস্থিমাংসেরই কারাগার।

কারাগার এক ভয়ঙ্কর মূর্তি—অর্ধেক গৃহ, অর্ধেক মানুষ—অদ্ভুত, পূর্ণাকৃতি অবিভেদ্য! আমি তার শিকার। আমার চিন্তায় সে বিভোর। আমায় সে করে আলিঙ্গন।

তার কঠিন প্রাচীরের ভেতর সে আমায় রেখেছে পুরে, বন্দী করে রেখেছে—লোহশলাকার মধ্যে।

হতভাগ্য জীব।

কি হবে আমার? আমায় নিয়ে তারা কি করবে?

[একুশ]

মনের স্বাভাবিক অবস্থা এসেছে ফিরে।

সব শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। কারাধ্যক্ষকে দেখে মনে যে ভয় জেগেছিল, সে ভয় গেছে কেটে।

স্বীকার করি, তখন আমার মনে ছিল আশা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আর সে ভরসা নেই···

আজকের ঘটনাটিই এখন লিপিবদ্ধ করবো।

সকাল সাড়ে ছ'টায়—না, পৌনে সাতটায় আমার সেল-এর দরজা খুলে গেল। আমার সামনে হাজির হলেন—শুভ্র কেশ একটি লোক। তাঁর সর্বাঙ্গ ছিল চাদর দিয়ে মোড়া, চেহারা দেখে অনুমান করতে পারলাম না, তিনিই জেলখানার ঠিক যাজক কি না! ভয়ঙ্কর এই মূর্তি।

একটুক অনুকম্পার হাসি হেসে তিনি বসলেন আমার পাশে, বল্লেন—বৎস, তুমি কি তৈরী হয়েছ?

ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলাম···আ—আমি—তৈরী নয়—প্রস্তুত। ঝাপ্সা হয়ে এলো দৃষ্টি, সর্বাঙ্গ ঘর্মশিক্ত হলো, শরীর কাঁপলো, মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ করে উঠ্লো।

তন্দ্রাবিষ্টের মতো অস্থিরভাবে চেয়ারের উপর শুয়ে পড়লাম।

—তাঁরই মুখের উপর নিবদ্ধ রইলো আমার দৃষ্টি। মুখভঙ্গী আর হাত নাড়া দেখে মনে হলো, তিনি তখনও কি বলছেন।

লৌহশলাকার আঘাতের শব্দে আমার তন্দ্রা ভাঙলো, যাজকের কথা থামলো।

কালো পোষাক-পরা একটি লোক জেলারের সঙ্গে এসে গম্ভীরভাবে আমায় জানালো অভিবাদন। বিষাদাচ্ছন্ন তার মুখখানি···নীরবে অশ্রুপাত করাই যেন তার কাজ। তার হাতে ছিল একটি কাগজের তাড়া।

ভদ্রতাসূচক হাসির সঙ্গে সে বল্‌লো···প্রধান এটর্ণি সাহেবের কাছ থেকে খবর নিয়ে আসছি। অহেতুক ত্রাস গেল কেটে।

ফিরে পেলাম নিজেকে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম···আমায় কি আজই ফাঁসি দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে? এটর্ণি সাহেবের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে—তিনি আমার মৃত্যুতে খুসী হবেন। এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁর। তবু তাঁর এ ব্যগ্রতা কেন?

বল্‌লাম···সংবাদটা একবার পড়ে যান দয়া করে। সে পড়তে লাগলো সুর করে, উঁচু গলায়—প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা করে, বেশ স্পষ্টভাবে—আমার আপীল অগ্রাহ্যের আদেশ।

আদেশ পাঠ শেষ করে সেই মোহর করা কাগজের ওপর থেকে মুখ না তুলেই বল্‌লো, আজই আদেশ পালন করা হবে।

আজ সাড়ে সাতটায় আমরা এখান থেকে যাচ্ছি— কন্‌সিয়ারজেরি কারাগারে। আপনিও দয়া করে আমাদের সঙ্গে যাবেন কি?

শ্রবণ-শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। কিছুই যেন শুন্‌তে পেলাম না আমি।

কারাধ্যক্ষ ও যাজক কথোপকথন করছিলেন। আর অর্দ্ধমুক্ত জানালার দিকে উদাসভাবে চেয়েছিলাম আমি।

উঃ—কী ভয়াবহ! ঐ যে বারান্দায় অপেক্ষা রত চারজন সৈনিক। আমার দিকে চেয়ে আগন্তুক পুনরুক্তি কর্‌লো তার প্রশ্নের।

উত্তর দিলাম···আমি তো আপনাদেরই আজ্ঞাবহ। আপনাদের যা' খুসী!

অভিবাদন জানিয়ে সে বল্‌লো···আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আস্‌ছি আপনাকে নিতে।

সবাই চলে গেল—যন্ত্র-চালিতের মতো। যদি পালাবার কোন উপায় থাক্‌তো।

আমি পালাবো—,নিশ্চয়—এখনই—জানালা টপ্‌কে, দরজার ফাঁক দিয়ে, ছাতের কড়িকাঠের ভেতর দিয়ে—শার্সি খুলে।

গায়ে আঁচড় লাগ্‌বে?

লাগুক্···এই সংগ্রামে যদি প্রাণও যায় তবু—, ভাল।

নরক—শয়তান—কারাগার!

যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কারাপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতে যে সময় লাগবে অনেক। যন্ত্রের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

এখানে যে একটি পেরেক পাবারও আশা নেই। মাস তো ভাল—আমার যে একঘণ্টা সময়ও আর নেই।

[বাইশ]

কন্‌সিয়ারজেরি কারাগার···

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে এখানে। আমার এই ভ্রমণকাহিনীটি বর্ণনার যোগ্য।

সাড়ে সাতটায় আমার সেল-এর দরজায় এসে রক্ষী বল্‌লে···আমি আপনারই অপেক্ষা করছি।

তার সঙ্গে ছিল আরো ক'জন লোক।

গাত্রোত্থান করে এক পা অগ্রসর হলাম। মাথা এত ভারী, পা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে দ্বিতীয় পদক্ষেপের শক্তি ছিল না আমার। তবু দুর্বলতাকে জয় করে যথাসম্ভব স্থিরভাবে চল্‌লাম।

একটা আকর্ষণ এসে পড়েছিল সেলখানির ওপর। সেই প্রিয় সেলখানি খোলা আর খালি রেখে এলাম আমি। কারা-কক্ষের এই দৃশ্য অবর্ণনীয়। তবে রক্ষী আমায় বলেছিল—ওটা বেশিক্ষণ খালি থাকবে না।

সেদিন সন্ধ্যায়ই সেখানে আর একজন কয়েদীকে আনা হবে। কোর্ট অব্ এসাইজেন্-এ হচ্ছে তার বিচার।

বারান্দার মোড়ে যাজক একত্র হলেন আমাদের সঙ্গে। প্রাতরাশ সেরে এসেছেন তিনি, জেলখানা ছাড়বার আগে কারাধ্যক্ষ করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। যোগ করে দিলেন রক্ষীদের সঙ্গে আরও চারজন রক্ষীকে।

একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলো জেলের সামনে—বিদায়। দু'জনে শিগগিরই দেখা হবে আবার।

প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলাম আমরা। একটু যেন সুস্থ বোধ করলাম—ঠাণ্ডা হাওয়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ বায়ু সেবন করার সৌভাগ্য হলো না।

বাইরে অপেক্ষায় ছিল একখানি জুড়ি গাড়ি। এখানেও এসেছিলাম সেই গাড়িতে চড়ে। গাড়িখানির দু'টি অংশ—জালের মতো, লোহার শিক দিয়ে আঁটা। দুদিকে দু'খানি দরজা। কী কদর্য! মনে হয় অনাথ-আশ্রমের শববাহী শকট-গুলোও যেন স্বর্গ—এর তুলনায়।

এই দ্বিচক্রযানের কবরের মধ্যে সমাহিত হবার আগে আমি একবার উঠানের দিকে চাইলাম—হতাশার সঙ্গে। দেয়ালগুলো যেন ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ছিল আমার সেই চাহনিতে।

ফটকের বাইরে ছোট্ট খোলা যায়গাটিতে দর্শকের ভিড়।

শিকল বাঁধার দিন যেমন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল, আজও চলেছে তেমনি অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ।

সাধারণত বছরের এ সময়ে এমন বৃষ্টি হয়। রাস্তায় জল জমে গেছে, প্রাঙ্গণ কর্দমালিপ্ত। কর্দমের মধ্যে প্রতীক্ষমান এই বিশাল জনতাকে দেখে আনন্দ অনুভব করেছিলাম আমি।

গাড়িতে উঠলাম।

সামনের কামরায় একজন রাজকর্মচারী আর একজন সান্ত্রী, অপর কামরায় আমি, যাজক ও আর একজন সিপাহী, গাড়ির চারদিকে চারজন অশ্বারোহী সৈনিক।

গাড়োয়ানকে বাদ দিয়ে, আমার জন্য—একটি লোকের জন্য—আটজন লোক!

যখন গাড়িতে উঠ্‌ছিলাম তখন একটি বৃদ্ধ আমায় উদ্দেশ্য করে বল্‌লো···বেড়ি-পরার চেয়ে এ অনেক ভালো···

আমিও তা' স্বীকার করি। এ দৃশ্য সহসা চোখে পড়ে, খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায়। এ অধিকতর লোমহর্ষক, অধিকতর জটিল! চিত্ত-বিক্ষোপের কিছু নেই? শুধু একটি লোক—। একই সঙ্গে রাখা কয়েদীদের চেয়ে অনেক বেশি তার দুঃখ। এ সংশোধিত মদিরা যেন তার চেয়েও সুস্বাদু।

গাড়ি চললো—ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দে। বন্ধ হলো কারাগৃহের ফটক। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম, মোহাচ্ছন্নের মতো এলো অবসাদ। নড়বার শক্তি নেই, মুখে ফুটছে না বাণী! মনে হচ্ছে—যেন আমায় জীবন্ত সমাহিত করা হচ্ছে।

—অস্পষ্টভাবে শুন্‌ছিলাম—গাড়ির ঘোড়ার গলায় আঁটা ঘণ্টার টুন্‌ টুন্‌, গাড়ির চাকায় পাথর চাপার মস্‌মসি অশ্বারোহী সৈনিকদের অশ্বখুরের আওয়াজ, উপরন্তু গাড়োয়ানের চাবুকের শোঁ শোঁ শব্দ!

আমি যেন এক প্রবল ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছি! বিমর্ষ, সম্বিৎহারা হয়ে পড়েছিলাম এই দুঃখে।

মনে হচ্ছিল—স্বপ্ন দেখছি।

হঠাৎ গাড়ির মোড় ঘুরে গেল। কারাগৃহটি চলে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে। চিন্তার গতিস্রোতও ফিরলো সঙ্গে সঙ্গে।

চোখ পড়্‌লো—"নটর ডেমের" নীল স্তম্ভের ওপর। মনে পড়্‌লো···তার অতীত ইতিহাস! মনে মনে বললাম—যারা এখানে উঠবে তারাই দেখতে পাবে আমার ফাঁসি—ভালভাবেই।

হাসলাম নির্বোধের মতো আপন মনে !

যাজক আরম্ভ করলেন কথা।

চাকার শব্দ, অশ্বখুরের আওয়াজ, গাড়োয়ানের চাবুকের ডাক তখনও শুনছিলাম। স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট হয়ে আসছিল—সেই শব্দগুলো।

বয়ে চললো—যাজকের কথার স্রোত। শুনলাম তাঁর কণ্ঠস্বর। নির্ঝরিণীর মধুর কলধ্বনির মতো, বন-ছায়াতরুর মৃদু মর্মরের মতো সেই স্বর আমার মনে এনে দিল অপরিসীম আনন্দ। রক্ষীদের একজন যাজককে বললো···আজকের খবর কি ?

গাড়ির ঘড়্‌ঘড়ানিতে বধির হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই তিনি রইলেন নিরুত্তর।

···আঃ, গাড়ির চাকার কি ভীষণ শব্দ ! কারো কোন কথা শোনার উপায় নেই। আজকে প্যারীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সংবাদ কি যাজক-মশাই ?

আজ এখনও কাগজ-পড়ার সময় হয়নি আমার। বিকালে পড়বো। কাজ থাকলে আমি চাকরকে বলে দিই কাগজগুলো যত্ন করে রেখে দিতে। কাজ সেরে বাড়ি ফিরে সেগুলো পড়ি।

বাঃ—রে, আমার কথাটিই আপনি বুঝতে পারেন নি। প্যারীর সংবাদ—আজকের সকালের সংবাদ।

বললাম···আমি জানি, আপনি কি বলতে চান।

আমার দিকে তাকাল সে।

—তুমি···? সত্যিই, বল, সে-সম্বন্ধে তোমার কি মত।

বললাম···আপনি কৌতূহলী।

—সে কি? সকলের একটা রাজনৈতিক মত থাকা দরকার। তোমারও যে কোন মত নেই, এমন মনে করা অন্যায়। 'জাতীয়-বাহিনী' পুনর্গঠন করার পক্ষপাতী আমি। আমি 'সার্জেন্ট' ছিলাম জাতীয় বাহিনীতে। আর সত্যি বলতে কি; সেটা ভালই। বাধা দিয়ে বললাম, আমি সেকথা ভাবিনি।

—তবে কি ভেবেছো? তুমি সংবাদ জানো বলেছিলে যে।

—এ ছাড়া আরও কিছু যা প্যারীকে আজ মগ্ন করে রেখেছে, আমি তার কথাই বলছিলাম।

নির্বোধটা তবু বুঝতে পারলো না আমার কথা। ঔৎসুক্য জাগলো তার।

—আরও কিছু সংবাদ! তুমি কোথায় সংবাদ পেলে? আর তাই বা কি? যাজক, আপনি কি জানেন সে সংবাদ? দয়া করে আমায় বলুন না। আমি সংবাদ সংগ্রহ করতে ভালবাসি। আর আমার মুখে খবর পেয়ে প্রেসিডেণ্ট খুবই খুসী হন।

একজনের পর আর একজনের মুখের পানে তাকালো সে; কিন্তু পেল না কোন সংবাদের সন্ধান।

বললো···বেশ, তুমি না কি ভাবছিলে! বললাম···আমি —ভাবছিলাম, আজ সন্ধ্যায় আমার আর কোন চিন্তাই থাকবে না।

—ও···তাই? তুমি দেখছি বিমর্ষ হয়ে পড়েছ। মিঃ কাসটাইঙ্গ তাঁর ফাঁসির দিনেও বেশ নিরুদ্বেগে কথোপকথন করেছিলেন।

তারপর একটু থেমে আবার বললো, আমি মিঃ প্যাপাভাইনের সঙ্গে ছিলাম তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। লা-রোকেল-এর যুবকরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছিল। তবু—বলেছিল তো! আর তুমি বোধ হয়—তুমি যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছ, যুবক।

—যুবক? আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়। প্রতি পনের মিনিটে আমার এক একটি বছর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে সে চাইলো আমার দিকে। হাসির সঙ্গে বললো···আমার চেয়ে বয়সে বড়? ঠাট্টা করছো? আমি বোধ হয় তোমার ঠাকুর্দার সমবয়সী—!

গম্ভীরভাবে বললাম···বিদ্রূপের প্রবৃত্তি আমার নেই।—আমি সত্যকথাই বলছি।

নস্যের কৌটাটি খুললো সে।

···এই নাও, রাগ করো না; এক টিপ নাও। মনে ক্ষোভ রেখ না এতটুকুও, আমায় কোর না ঘৃণা!

—ভয় কি আপনার? আমি তো বেশিক্ষণ আর আপনার সম্বন্ধে ঘৃণা পোষণ করবার অবকাশ পাবনা।

লোহার শিকের ভেতর দিয়ে সে কৌটাটি এগিয়ে ধরলো আমার দিকে। শিকে আঘাত লেগে কৌটাটি মাটিতে পড়ে গেল—একেবারে তার পায়ের তলায়।

—যাঃ—আমি তবে অপয়া? আপনার সব নস্যটুকুই নষ্ট হোল!

—আপনার চেয়ে আমারই ক্ষতি হোল বেশি।

—আমার চেয়ে বেশি! সহজেই বলে গেলে একথা! প্যারীতে না পৌঁছা পর্যন্ত রাস্তায় আর কোথাও নস্যই পাবনা, ওঃ—

যাজক প্রবোধ দিলেন তাকে।

তারা দুজনে আলাপ আরম্ভ করলো। আবার আমি চিন্তার মধ্যে হারিয়ে ফেললাম নিজেকে।

গাড়িটি শুল্ক-গেটের সামনে থামলো এক মিনিটের জন্য। ইনস্‌পেক্টর সাহেব গাড়িটি পরীক্ষা করে নিলেন। যদি গাড়িতে কসাইয়ের কোন ভেড়া বা ষাঁড় থাকতো তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যেতো। কিন্তু মানুষের মুণ্ডের যে কোন শুল্ক নেই।

ফুবর্গ, মারকিউ আর নগরীর রাস্তাগুলোর উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে চললো গাড়িখানি। গাড়ির চাকাগুলোর আওয়াজ হচ্ছিল ভয়ানক। তাই, আর কোন শব্দই শুনতে পেলাম না আমি—যদিও আমি লক্ষ্য করেছি—গাড়িটি চলবার সময় লোক-গুলো করেছে উল্লাসধ্বনি, অতি-কৌতূহলী শিশুর দল কিছুদূর পর্যন্ত ছুটেছে তার পেছনে পেছনে।

মনে হচ্ছিল—রাস্তার চৌমাথায় ছেঁড়া কাপড় পরা কতগুলো লোক হাতে ছাপার কাগজের তাড়া নিয়ে মুখে মুখে কি যেন ঘোষণা করছিল, পথচারীরা কাগজ কিনবার জন্য থামছিল মাঝে মাঝে···

গাড়ি থামল। রেল গাড়িতে চড়ান হলো আমায়। একটির পর আর একটি গাড়ি!—জলপথ স্থলপথে যাত্রা।

পরদিন···

কশনিয়ারজেরি জেলের সামনে থামলো—কয়েদীর গাড়ি। ঘরের সিঁড়ি, আঁধার কক্ষ বিশাল প্রবেশপথ দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

অতি কষ্টে ফিরিয়ে আনলাম চেতনা।

বিদ্যুৎগতিতে খুলে গেল জেলখানার দরজা। চাকার—উপর পা দিয়ে নিচে নেমে এলাম। আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেছে!

দুপাশে সৈনিক।

আমায় ভেতরে নেওয়া হোল তাদের ভেতর দিয়ে। চারিদিকে জমেছিল ভিড়—আমায় দেখবার জন্য উৎসুক জনতা!

[তেইস]

যখন গ্যালারির মধ্য দিয়ে চলেছিলাম তখন কোন অশান্ত ভাব ছিল না আমার মনে।

কিন্তু মনের সকল দৃঢ়তা গেল কেটে—যখন আমায় নেওয়া হোল একখানি নিচের ঘরে—। ঘরখানির সিঁড়ি নিচের দিকে, বারান্দা মাটির নিচে।

যারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—কিংবা যারা সেরূপ দণ্ড পেতে পারে তাদেরই সেখানে রাখা হয় গোপনে।

জেলারের ঘরে গিয়ে রক্ষী আমার ভার বুঝিয়ে দিল। জেলার তাকে বললেন, তার গাড়িতে আর একটি শিকার নিয়ে যেতে হবে।

সে-লোকটি নিশ্চয়ই সেদিনই দণ্ডাদেশ পেয়েছে। সে হয়তো সেখানে আমারই পরিত্যক্ত শয্যায় শয়ন করবে।

রক্ষী বললো, বেশ, আমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছি।

জেলারের ঘরের পাশে একখানি কামরায় পুরে রাখা হোল—একা, আগলবদ্ধ অবস্থায়।

কি ভাবছিলাম বা কতক্ষণ ছিলাম সেখানে কিছুই মনে নেই।

একটা উচ্চ হাসির শব্দে জেগে উঠলাম। চমকিত হয়ে দেখলাম—সেখানে আমি একা নই। একজন পঞ্চাশ বছরের লোক রয়েছে আমার সঙ্গে। বেশ লম্বা চেহারা, চোখ দুটো কালো, মুখে বিদ্রুপের হাসি, পরণে একখানি আধ-ময়লা ছেঁড়া কাপড়। উপেক্ষাত্মক তার দৃষ্টি।

মনে হয়, দরজা খুলে তাকেও পুরে রাখা হয়েছে আমারই মতো। আমি তা লক্ষ্য করতে পারিনি। মরণও যদি এমনি অলক্ষিতে আসতো!

কয়েক মুহূর্ত ধরে দেখলাম একে অপরকে।

উচ্চ হাসি হেসে উঠলো সে। ভীত, বিস্মিত, অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম···তুমি কে?

—ভাল প্রশ্নই বটে! আমি? আমি একটা শিকার!

—তার মানে?

প্রশ্ন শুনে সে হেসে খুন হয়ে গেল। বললো···তার মানে হলো এই, যে জল্লাদ আমার শব নিয়ে ডাণ্ডাগুলি খেলবে; অর্থাৎ ছ' সপ্তাহের মধ্যে আমার দেহখানি বাক্সে পুরে রাখা হবে—যেমন ছ'ঘণ্টার মধ্যে তোমারও হবে সেই একই অবস্থা। হাঃ—হাঃ—হাঃ। এবার বুঝলে তো আমার কথা?

সত্যিই, বিমর্ষ হয়ে গেলাম আমি। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সর্বশরীর।

এ লোকটি একজন দণ্ডিত অপরাধী—আমারই পরিত্যক্ত সেল-এর উত্তরাধিকারী যাকে ওরা রিক্টারে পাঠাবার আয়োজন করছে।

সে বললো, জানতে চাও আমার ইতিহাস? আমার বাবা ছিলেন একজন নামজাদা চোর। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জল্লাদের হাতেই আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তখন আমিই ছিলাম প্রবল। দু'বছর বয়সে আমি মাতৃপিতৃহীন হয়েছি। গরমের দিনে আমি রাজপথের ধুলোয় ডিগবাজি খেতাম, দৌড়তাম। মঞ্চগাড়ির জানালা দিয়ে আরোহীরা এক আধটা আধলা ছুঁড়ে দিত; শীতের দিনে খালি পায়ে চলতাম কাদার ভেতর দিয়ে। ঠাণ্ডায় পায়ের আঙ্গুল অবশ হয়ে যেতো। আমার ছেঁড়া পাজামা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ন'বছর বয়সে আমার জীবিকার্জনের ভার আমায় নিজেকেই নিতে হলো। সময় সময় কারো গাঁট কাটতেও দ্বিধা করতাম না। চুরিও করতাম কখনও কখনও। দশ বছর বয়সে আমি হলাম পাকা চোর। সেই সময়ে ক'জন নতুন লোকের সঙ্গে হলো আমার পরিচয়। তাদের কৃপায়—সতের বছর বয়সে আমি হলাম সিঁদেল চোর। সিঁদ কেটে একটি দোকানে ঢুকে তালা ভাঙছিলাম। এমন সময় পড়লাম ধরা। বিচারে হলো কারাদণ্ড। সমুদ্রে পাঠানো হলো—জাহাজের মাল্লার কাজে। উঃ! সে কি কঠোর জীবন! মেঝেয় শুতে হতো, খাবার পেতাম

—কালো রুটি, কাজ ছিল—জাহাজের চেন টানা। অসহ্য জীবন! মাথার চুলগুলো কামান হলো। কী সুন্দর কোঁকড়ানো ছিল আমার চুলগুলো! যা হোক···

পনেরটি বছর আমি কাটালাম। তারপর উত্তীর্ণ হলো আমার শাস্তির ম্যাদ। তখন আমার বয়স বত্রিশ।

এক মনোরম প্রভাতে আমার ছাড়পত্র, রাস্তার একটি মানচিত্র আর দেওয়া হলো পনেরটি টাকা—পনের বছর দৈনিক ষোল ঘণ্টা, মাসে তিরিশটি দিন—হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে।

যা হোক, ঐ কটি টাকা সম্বল করে ভালো মানুষ হবো ভাবলাম। কিন্তু শয়তান যে নাচ্‌ছিল—আমার ছাড়পত্রখানির ভেতর। পত্রখানি ছিল হল্‌দে রঙের। তার উপরে লেখা বড় বড় হরফে—"মুক্ত কয়েদী"। যেখানে যাই সেখানেই দেখাতে হবে সেটি—যখনই পুলিশ চাইবে। যে শহরে যাবো তার মেয়রকে, গ্রামের প্রেসিডেণ্টের কাছে দাখিল করতে হবে সেটি।

অত্যাশ্চর্য প্রশংসাপত্র—'মুক্ত কয়েদী'···

আমার চেহারা দেখে লোকে ভয় পেত; ছেলেরা দল বেঁধে দৌড়তো, সবাই থাকতো দরজা বন্ধ করে।

কোথাও কোন কাজ পাওয়া পেলাম না, কেউ আমায় কাজ দিল না। অথচ টাকাগুলো খরচা হয়ে গেল।

কিন্তু আমায় তো বাঁচতে হবে! লোকের কাছে ধন্না দিলাম কর্মক্ষম বলিষ্ঠ বাহু দেখিয়ে চাইলাম—শারীরিক শ্রমের কাজ; তাতেও কেউ রাজী হলো না আমায় কাজ দিতে। নামমাত্র

পারিশ্রমিকে কঠোর শ্রম করতে স্বীকার করলাম, তবু-ও না।

আমি আর কি করবো ?

সম্বল নেই, কাজ করবার শক্তি থেকেও তা' ব্যবহারের উপায় নেই।

ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে একদিন রুটিব দোকানের দরজা ফাঁক করে একখানি রুটি নেবার চেষ্টা করতেই রুটিওয়ালা আমায় পাকড়াও করলো—রুটিটি খেতে পারিনি, তবুও—। এবার আমায় দেওয়া হলো—যাবজ্জীবন দণ্ডভোগেব আদেশ। কাঁধের চামড়া পুড়িয়ে তিনটি অক্ষর খোদাই কবে দেওয়া হোল—আমি পুরানো পাপী একথা প্রমাণ করবার জন্য।

সেখান থেকে আমায় আবাব পাঠান হলো—টোলনেব কারাগাবে।

এবার পালাবার চেষ্টা না করে পারলাম না। তিনটি প্রাচীব ডিঙিয়ে, তিনটি শিকল কেটে পালিয়ে গেলাম কারাগাব থেকে। বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে ওরা করলো—কয়েদীব পালাবাব সঙ্কেতধ্বনি !

আমার অর্থ নেই—ছাড়পত্র নেই! আমি পলাতক। একদল ডাকাতের সঙ্গে এসে জুটলাম। দলের সকলেই আমারই মত পলাতক কয়েদী অথবা মুক্ত অপরাধী। সর্দার সাগ্রহে আমায় দলে ভর্তি করে নিল।

রাজপথে লুণ্ঠন ও নরহত্যাই ছিল তাদের জীবিকার্জনের উপায়। নিজের জীবনরক্ষার জন্য অপরের জীবন নেওয়াই হলো আমার কাজ।

গাড়িতে টাকা নিয়ে যাবার সময় গাড়ি আক্রমণ করে আরোহীদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিতাম আমরা। গরু-ঘোড়া ছেড়ে দিতাম, গাড়ি দূরে ছুঁড়ে ফেলতাম, আর তার হতভাগ্য আরোহীদের মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতাম। তারপর তাদের কবরের উপর ঘাস বিছিয়ে দিয়ে তার উপর নাচতাম—যেন কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে মাটি খোঁড়া হয়েছে সেখানে।

এমনিভাবে কাটতে লাগল আমার দিনগুলো। আশ্রয়—বন, চন্দ্রাতপ—উদার নীল আকাশ; কাজ—বনে বনে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু স্বাধীন।

দুনিয়ার সব কিছুরই শেষ আছে। সেই জীবনের হলো অবসান! আমি ধরা পড়লাম—এক সুন্দর রাত্রিতে। সঙ্গীরা সবাই গেল পালিয়ে।

সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে উঠবার বাকি সুধু শেষটি!

পকেট-কাটা কিংবা মানুষ-মারা আমার পক্ষে এখন সমান অপরাধ। পুরানো, পলাতক আসামী আমি। মরণেই আমার শেষ। সুতরাং আমার বিচার তেমন কিছু নয়। বুড়ো হয়েছি, কিন্তু আমার কোন পরিবর্তন হয় নি এখনও। আমার বাবার ফাঁসি হয়েছিল, আমিও চলেছি—সেখানে চিরবিশ্রামের আশায়···

স্তব্ধ বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম।

সে হাসতে লাগলো হো—হো করে, হাত বাড়ালো করমর্দনের জন্য।

ভয়ে পিছিয়ে পড়লাম।

সে বললো···বন্ধু, তোমার বুকে সাহসের অভাব দেখছি। কাপুরুষের মত মৃত্যুকে ভয় করো না। এক অশুভ মুহূর্তে মানুষ গলায় পরে ফাঁসির রজ্জু; কিন্তু নিমেষে শেষ হয়ে যায় সবই। শেষের দিনে আমি যদি উপস্থিত থাকতে পারতাম, তাহলে আমি তোমায় উৎসাহিত করতে পারতাম। বিশ্বাস কর, তোমারই সঙ্গে, আজই যদি আমায় ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে আমি আর আপীল করবো না। একই যাজকের কাছে আমাদের দু'জনের আজ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করবো। দেখলে তো, আমি কেমন ভাল মানুষ! তুমি কি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

সে এগিয়ে এলো একটু কাছে।

তাকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে বললাম···মশায়, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি তা চাইনা।

আমার কথা শুনে সে আবার উচ্চ হাসির রোল তুললো। বলল···তুমি নিশ্চয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক।

বাধা দিয়ে বললাম···দেখুন, আমি একটা বিষয় চিন্তা করছি, আমায় অনুগ্রহ করে একা থাকতে দিন।

সে যেন এতটুকু বিচলিত হলো আমার কথায়। বুকের দীর্ঘ কেশরাজির উপর হাত বুলাতে বুলাতে ঘাড় নেড়ে বললো; হাঁ আমি বুঝেছি। ঐ আকাশচারী অদৃশ্য ভগবানের সঙ্গে আলাপ।

তারপর!

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভয়ে ভয়ে আমায় বললো, সত্যিই তুমি সম্ভ্রান্ত   তা' ভালো। তোমার গায়ের কোটটিতে তো আর তোমার প্রয়োজন নেই। জল্লাদই ওটা নিয়ে নেবে। আমায় কোটটি দাওনা ভাই, ওটি বিক্রি করে তামাক কিন্‌বো।

বিনা কথায় ওভার-কোটটি খুলে তার হাতে দিলাম। অস্বাভাবিক আনন্দে সে হাততালি দিয়ে উঠলো আর আমায় শীতে কাঁপতে দেখে বল্‌লো—তোমার শীত লাগছে, এটা পর।

বৃষ্টি পড়ছে। তুমি ভিজে যাবে। তা' ছাড়া গাড়িতে যেতে হ'লে পোষাকও তো চাই! তাই সে তার ধূসর রঙের উলের জামাটি আমার গলায় পরিয়ে দিল।

কোন আপত্তি করলাম না আমি। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। এই লোকটিকে দেখে আমার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল বল্‌তে পারি না। সে আমার দেওয়া কোটটি বার বার পরীক্ষা করে দেখছিল আর থেকে থেকে গভীর আনন্দসূচক ধ্বনি করছিল—পকেটটি যে এখনও একেবারে নতুন—কলারটি একটুও নষ্ট হয়নি—পঞ্চাশ টাকার কম হবে না এর দাম! কি সৌভাগ্য! এতে আমার বাকী ছ' সপ্তাহের তামাকের খরচটা অনায়াসে চলে যাবে।

...দরজা খুলে গেল আবার। রক্ষীরা আমায় নিয়ে গেল সেই ঘরে—যেখানে দণ্ডিতেরা অপেক্ষা করে চরম মুহূর্তের।

অপর লোকটিকে রিক্টার-এ নিয়ে যাবার জন্যও এলো রক্ষী হোঃ! হোঃ! করে হেসে সে বললো তাদের—দেখছ না, আমরা পোষাক বদল করেছি। ভুল করে তার জায়গায় রেখো না

আমায়। তা'ছাড়া ছ' সপ্তাহের তামাকের পয়সাও জোগাড় করেছি আমি।

[চব্বিশ]

বুড়ো হারামজাদা!

সে আমার কোটটি নিয়ে গেল। আমি তাকে ইচ্ছে করে দেয়নি ওটা। তার বদলে সে আমায় দিয়েছে—তার ছেঁড়া, ময়লা একটি জামা। কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে আমাকে।

ঔদাসীন্যে বা দাক্ষিণ্যে আমি সেটি তাকে দান করি নি। সে আমার চেয়ে বলিষ্ঠ; তাই আমি তাকে দিয়েছি কোটটি। নইলে সে হয়ত আমায় লাগিয়ে দিত—ছু' চারটে ঘুসি!

দানই বটে! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল মনখানি। ইচ্ছা হচ্ছিল—চোরটাকে গলা টিপে মারি—পদদলিত করি। ঘৃণায় অবজ্ঞায় ভরে উঠ্‌লো সারা অন্তর। আসন্ন নির্মম মৃত্যুভয় মানুষকে করে শয়তান...

ওরা আমায় আবদ্ধ করে রেখেছে ছোট্ট একখানি কক্ষে। তার চারদিকে চারটি দেয়াল, জানলায় দরজায় অসংখ্য লোহার শিক। কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি চেয়ার, টেবিল আর কিছু কাগজ চাইলাম। সৌভাগ্যক্রমে তা' আমি পেয়েছিলাম। তারপর চাইলাম একদিন—একখানি বিছানা।

রক্ষী আমার দিকে চাইলো বিস্ময়ের সঙ্গে। মনে মনে যেন বললো—বিছানায় কি হবে তোমার? যা'হোক্, একখানি তক্তপোষ এনে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে এলো একজন

সান্ত্রীও। ওরা কি আশঙ্কা করছে—আমি গলায় চাদর জড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাব?

কিন্তু তা'হলে—যে তাদের সকল আয়োজনই পণ্ড হয়ে যাবে!

[পঁচিশ]

দশটা!

হায় রে, অভাগিনী মেয়ে! আর মাত্র দু'টি ঘণ্টা পরেই তোর বাবা মরবে, তার দেহখানি মাটির ওপর দিয়ে টেনে বার করে হাসপাতালের শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষা করা হবে। তারপর ক্ষতবিক্ষত দেহটিকে শবাধারে পুরে' দুষ্কৃতদের কবরভূমিতে করবে সমাহিত।

তবু, ওরা কেউ আমাকে ঘৃণা করে না, অনুকম্পা দেখায়। ওরা পারতো আমায় বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু তারা আমায় হত্যা করবেই।

মেরী! তুই কি তা' বুঝতে পারছিস্? ওরা আমায় মারবে শ্বাস রোধ করে। কেন···জানিস? সাধারণের কল্যাণের জন্য।

ভাগ্যহীন শিশু! তোর বাবা—যে তোকে এত ভালবাসতো, যে তোর দুটো গাল ভরিয়ে দিত অজস্র চুম্বনে, সস্নেহে আঙুল বুলিয়ে দিত তোর কাল চুলগুলিতে, খেলতো তোকে বুকের ওপর বসিয়ে, সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতো—হাত দুটো জোড় করে,—সে আর বাঁচবে না—বাঁচতে পারবে না!

এর পর কে তোকে এম্‌নি আদর করবে? কে ভালবাসবে তোকে?

সুন্দর উপহার, ভালো খেলনার জন্য কার কাছে যাবি তুই—? কেমন করে চলবে তোর খাওয়া-পরা ?...তোর বয়সী আর আর শিশুদের বাবা থাক্‌বে, সুধু থাকবে না তোর—অভাগিনী পিতৃহীনা মেয়ে !

জুরীরা, বিচারকরা যদি একবার আমার মেরীকে দেখতো, তবে বুঝতো—তিন বছরের এই শিশুর বাবাকে হত্যা করা অন্যায়। যখন সে বড় হবে,—যদি কখনও হয়—কি হবে তার ? প্যারী শহরের লোকের কাছে তার বাবা হবে একটা কলঙ্ক। আমার নামে সে পাবে লজ্জা। লোকে তাকে ঘৃণা করবে। সকলের কাছে সে হবে পতিত—আমারই জন্য।

আমি যে অন্তরের সকল সরলতা দিয়ে তাকে ভালবাসি ! আমার প্রিয় মেরী ! একি সত্য হতে পারে, তুই আমারই নামে হবি লজ্জিত, পাবি ভয় ?

দুর্ভাগা আমি ! সমাজের কাছে কি অপরাধ আমার ? সত্যিই কি আজকের রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমি মরবো ? একি আমি ?—সত্যিকারের আমি ?

বাইরের গুন্ গুন্ রব, বারান্দায় ঐ হর্ষোৎফুল্ল জনতা, ঐ রক্ষী, সেই কালো পোষাক-পরা যাজক, ঐ লাল শার্টওয়ালা লোকটি—এরা সব কি আমারই জন্য ? সত্যিই কি আমি মৃত্যুপথ-যাত্রী আজ ?

আমি কি সেই আমি—যে আজ এখানে, যার দেহে আছে প্রাণ, আছে গতি—আছে স্পন্দন,—যে আমি স্পর্শ করি—অনুভব করি,—এখনও ভাঁজে-ভাঁজে ঝুলছে যার পোষাক ?

[ছাব্বিশ]

যদি জান্‌তাম—ফাঁসিমঞ্চ কেমন করে তৈরী হয়, কেমন করে মানুষ সেখানে হারায় এই অমূল্য জীবন !

ফাঁসি ! কী ভয়ঙ্কর এই নামটি ! এখন ভাবতেও পারি না সেকথা ! লেখা তো দূরের কথা ! তবু, সে-নাম উচ্চারণ কর্‌তে পারছি কেমন করে ? সেই দু'টি অক্ষর !

তাদের আকৃতি, দৃষ্টি—মানুষের মনকে করে আতঙ্কিত। তার মূর্তি—এই ভয়ানক বাক্যটি—অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট,—তার চেয়েও অশুভ। আমি ভেঙে ফেলতে চাই তার সেই আকার ! সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সাহস আমার হয় না। কিন্তু ফাঁসি যে কি, কিভাবে হয় তার প্রক্রিয়া—এ জ্ঞান না থাকা আরও ভীতিপ্রদ।

আমার সর্বাঙ্গ হয়ে যাবে শীতল, সিত—মাথায় জমবে রক্ত !...তবে হ্যাঁ, আমি একবার ফাঁসি দেওয়া দেখেছি। সেদিন বেলা এগারোটায় গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিলাম জেলখানার সুমুখ দিয়ে ! হঠাৎ পথের উন্মত্ত জনস্রোতে রুদ্ধ হলো শকটের গতি !

পাল্কী-গাড়ির জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাইরে পথে, চারদিককার ঘরের ছাদে, পাহাড়ে, অসংখ্য নরনারী দাঁড়িয়েছিল উদ্‌গ্রীব, উৎসুক।

জেলখানার বাইরের মাঠে তিনজন লোক তৈরী করছিল—লাল কাঠের একটি মঞ্চ। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন অপরাধীকে সেদিনই দেওয়া হবে ফাঁসি—আর সেই ব্যবস্থাই চলেছে তখন।

বিরক্তিভরে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। শুনলাম, গাড়ির কাছে

দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক তার ছেলেকে বল্‌ছে—দেখ্, দড়িটা ঠিক ভাবে লাগানো হয়নি।

আজ—আজ হয়তো তারা তা'ই করছে।

এগারোটা বাজলো। তারা নিশ্চয় খাদ কাটছে। হায় রে দুর্ভাগা! এবার তো আর আমার গলাটি সরিয়ে নিতে পারবো না—পারবো না বাঁচতে!···সেদিন আমি ছিলাম দর্শক, আর আজ আমি দর্শনীয়। এ যে স্বপ্নাতীত; তবু সত্য—নির্মম সত্য!

[সাতাশ]

ক্ষমা! অবকাশ—অব্যাহতি!

তারা হয়তো আমায় দেবে কিছুদিনের অবকাশ—স্থগিত রাখবে শাস্তি। রাজা বিরাগ ন'ন আমার উপর।

আমার কৌঁসুলীর সঙ্গে দেখা করবো। ডেকে নিয়ে এসো তো আমার কৌঁসুলীকে। আমি কারা-দুঃখ বরণ করবো—পাঁচটি বছর, কিংবা আ-জীবন পায়ে বেড়ি পড়বো, তবু আমাকে ভিক্ষা দাও জীবন—দাও শান্তিতে বাঁচতে!

দণ্ডিত অপরাধী! সে চল্‌তে পারে—দু'পায়ে ভর করে, তার ধমনীতে বয় তপ্ত রক্তস্রোত, নিশ্বাস পড়ে, মুক্ত সূর্যালোকে সে করতে পারে আসা-যাওয়া!···দেখা করবো—কৌঁসুলীর সঙ্গে। তিনি হয়তো আমার দণ্ড-হ্রাসের কোন উপায় বাত্‌লে দিতে পারেন···তাঁর সকল প্রচেষ্টা, সকল বক্তৃতা হয়েছে নিস্ফল। তবু, কেন আমার এ বিশ্বাস···

[আটাশ]

যাজক এসেছেন ফিরে। তাঁর চুল সাদা, দৃষ্টি মধুর, প্রশান্ত মুখশ্রী, সুগঠিত দেহ—যেন করুণার প্রতীক। সত্যিই তিনি সৎ, দয়ালু।

সকালে দেখেছি, তিনি তাঁর টাকার থলিটি উজার করে বিলিয়ে দিয়েছেন কয়েদীদের। তবু, তাঁর কথা শুনে মানুষের মন গলে না কেন? তাঁর উপদেশবাণী কেন স্পর্শ করে না আমার অন্তর? ভোরের বেলায় মনখানি ছিল চঞ্চল, তাঁর কথা শুনতে পাই.নি আমি। অর্থহীন তাঁর কথাগুলো বরফ-জমা জানালার ওপর ঠাণ্ডা জলের ছিটার মতো মনে হয়েছিল আমার।

তাঁর দৃষ্টি যখন আমার উপর পড়লো, একটু ভরসা হোল তখন। মনে হলো—এতগুলো লোকের মধ্যে একমাত্র তিনিই পারেন আমায় এতটুকু সাহায্য কর্‌তে। তাঁর কাছে সান্ত্বনার উপদেশ-বাণী শোন্‌বার ব্যাকুলতা উঠ্‌লো জেগে।

চেয়ারে বসেছিলেন তিনি, আর আমি ছিলাম বিছানার ওপর। তিনি বললেন, বৎস!—এই একটিমাত্র শব্দ আমার অন্তরখানি ছুঁয়ে গেল। বৎস, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর?

হ্যাঁ···

তুমি পবিত্র ক্যাথলিক, "য়্যাপস্টলিক্" আর রোমান ক্যাথলিক ধর্ম মান?

নিশ্চয়···

তোমার যেন সন্দেহ আছে বৎস!···

অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি অনেক

বিষয়। তারপর বললেন, আচ্ছা এখন উঠি। আমিও দাঁড়ালাম বিস্ময়াবিষ্টের মতো। হ্যাঁ! আপনি এখন যেতে পারেন।... আবার কখন আসবো?...জিজ্ঞেস করলেন তিনি।—আপনাকে খবর পাঠাবো। আর একটি কথাও না বলে তিনি চলে গেলেন। মাথা নেড়ে যেন অস্পষ্টভাবে বলে গেলেন—নাস্তিক!...

না! আমি আজ নিচে নেমে এসেছি বটে, তবু নাস্তিক নই আমি। আমি আজ বিপন্ন। ভগবানই জানেন, আমি তাঁকে সত্যিই বিশ্বাস করি।

কিন্তু ঐ লোকটি আমায় কি বল্‌লেন? অন্তর স্পর্শ করে না তাঁর কথাগুলো। তাঁর বাণী শুনে চোখে জল আসেনি আমাব, ভাবের পরিবর্তন ঘটে নি এতটুকুও। এ তো তাঁর অন্তরেব কথা নয়। এ মামুলি বাণী তিনি সকলকেই শোনান।

সোজা কথাকে ঘুরিয়ে, অপ্রয়োজনীয় যায়গায় জোর দিয়ে তিনি শুনিয়েছেন—ধর্মের উৎক্ষিপ্ত বাণী, আর সেণ্ট অগষ্টাইন্ গ্রেগরী-প্রমুখ মহাপুরুষদের নাম। হয়তো ভেবেছিলেন...কি আর আমি জানি, কি-ই বা বুঝি? তাঁব কথায় বুঝলাম, যে শ্লোকগুলো আমায় শোনালেন তিনি, এর আগেও সহস্রবার তিনি আবৃত্তি করেছেন—সেগুলো। কোন আড়ষ্টতা ছিল না তাঁর বাচনভঙ্গীতে। পলকহীন ছিল তাঁর দৃষ্টি, স্বর ছিল স্বাভাবিক, অপবিবর্তিত, দেহখানি ছিল নিশ্চল। তিনি যে কারাগারের অন্যতম ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁর কাজ কয়েদীদেব সান্ত্বনা, উৎসাহ আব উপদেশ দেওয়া। জীবিকার্জনের এই তাঁর উপায়।

রোগগ্রস্ত এবং দণ্ডিত অপরাধীরা তাঁর কথা শুনে হয় আত্মবিস্মিত, উৎসাহিত। তারা তাঁর কাছে স্বীকার করে নিজেদের অপরাধ, আর হয় অনুতপ্ত। তিনি তাদের ধর্ম উপদেশ দেন।

মানুষকে মরণের পথে এগিয়ে দিতে দিতে বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। যে-কাজে অপরের মনে জাগে ভয়, সে-কাজে তিনি হয়ে পড়েছেন অভ্যস্ত। কারাগারে এলে তাঁর সাদা চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে না। কারাগার—ফাঁসিমঞ্চ—এ তো তাঁর চির পরিচিত। তিনি নোট-বইটিতে বড় বড় হরফে লিখে রেখেছেন—ধর্মের বাণী—কয়েদীদের জন্য আর মরণদণ্ডে দণ্ডিতদের জন্য আলাদা করে।

আগের দিন রাতেই খবর পাঠানো হয় তাঁর কাছে—পরদিন সকালে জেলখানায় উপস্থিত থাকতে হবে তাকে। তিনি সংবাদ-দাতার কাছ থেকে জেনে নেন—দণ্ডিত লোকটি সম্বন্ধে মোটামুটি খবর। তাঁর খাতা থেকে শ্লোক আওড়ে নেন তারপর। সব রকমের কয়েদীই তাঁর কাছে সমান। তাঁকে যেতে হয় সবারই কাছে।

জেল-কর্তৃপক্ষ যদি কোন তরুণ যাজক কিংবা প্রবীণ মঠাধ্যক্ষকে নিয়ে আস্‌তেন এঁর পরিবর্তে তা'হলে তাঁরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতো মরণপথের যাত্রী এ। তোমার কর্তব্য একে সান্ত্বনা দেওয়া। তুমি যাবে সেখানে যেখানে বাঁধা হবে তার হাত-পা, থাকবে সেই মরণ-শকটে, তোমার ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিটি দিয়ে লুকিয়ে রাখবে জল্লাদকে। জনতার মধ্য দিয়ে যখন সে অগ্রসর হবে ফাঁসিমঞ্চের দিকে, তখন তুমিও যাবে তার সঙ্গে।

মঞ্চে উঠ্‌বার আগে চুম্বন কর্‌বে তার শির, তার আত্মাটা উড়ে বাতাসে যতক্ষণ না মিশে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে তার সঙ্গে···তারপর তারা আমার কাছে তাঁকে আনতো। আবেগে কম্পিত হতো তাঁর আপাদমস্তক। তখন আমি হতাশায় তাঁর বাহুর মধ্যে নিজেকে সপে দিতাম, তাঁর পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতেম, তিনিও কাঁদতেন, দু'জনে কাঁদতাম এক সঙ্গে। তাঁর আবেগপূর্ণ বাক্যে আমি পেতাম সান্ত্বনা।

কিন্তু এই বৃদ্ধ যাজক? তিনি আমার কাছে কি···আমি বা তাঁর কি! দুর্ভাগাদেরই একজন—তাঁরই পরিচিত একটি ছায়া—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের তালিকায় একটি নতুন নাম! তাঁকে বিদায় দিয়ে ভাল করিনি হয়তো। তিনি সৎ কি দুর্জন জানি না। এ যে আমার দোষ নয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আমি।

আমায় খাবার দিয়ে গেছে। তারা মনে করে এখনও প্রয়োজন আছে আমাব খাদ্যের। খেতে চেষ্টা করলাম—কটি ভাল ভাল খাবার—যা' আমি আগে উৎসাহের সঙ্গে খেতাম—আমার প্রিয় সব খাদ্য! হাত কাঁপলো। মুখের গ্রাস নিচে পড়ে গেল, মুখে খাবারের কণাগুলো লাগ্‌লো—তিক্ত, বিস্বাদ।

আমি যে পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছি!

[উনত্রিশ]

এইমাত্র একজন বৃদ্ধ এসেছে, টুপিটি মাথায় পরে আমায় লক্ষ্য না কবে—একটি "স্কেল" দিয়ে দেয়ালগুলো মাপতে

মাপ্তে আপন মনে বল্ছে···এতে চল্‌বে—উঁহু—হবে না।

রক্ষীকে জিগ্যেস করলাম, এ লোকটি কে? মনে হলো—কারাগারের মিস্ত্রী। তারও কৌতূহল হলো আমার জন্য। রক্ষীর সঙ্গে দু'একটি কথা বলে আমার দিকে চেয়ে সে মাপ নিতে লাগলো আবার।

কাজ শেষ করে আমার কাছে এসে বললো, বন্ধু, ছ'মাসের মধ্যে কারাগারের অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। কিন্তু, তোমার দুর্ভাগ্য, সে সুখ উপভোগ কর্‌তে পারলে না। একটু ক্ষীণ হাসি হাস্‌লো সে।

ভাবলাম—আমার সঙ্গে সে তামাসা করছে, বিয়ের রাতে অভ্যাগতেরা যেমন বরকে ঠাট্টা করে ঠিক তেমনি ভাবে।

একজন প্রবীণ সৈনিক আমার রক্ষী। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললো, দেখুন মশায়, যে লোকটি সংসার থেকে অকালে বাধ্য হয়ে বিদায় নিতে বসেছে, তার ঘরে দাঁড়িয়ে এত চেঁচিয়ে কথা বলা ঠিক নয়।

মিস্ত্রী বেরিয়ে গেল—বিনা বাক্যব্যয়ে। দেয়ালে-গাঁথা পাথরগুলোর মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি ···

ইদানীং একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ছুটি দেওয়া হলো—আমার পুরানো রক্ষীটিকে। অকৃতজ্ঞ, আত্মম্ভরী আমি একবার করমর্দনও করিনি তার সঙ্গে। তার যায়গায় এলো আর একজন। তার কপালটি উঁচু, চোখ দুটো ঘোলাটে, মুখখানি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। টেবিলের সামনে কপালে হাত দিয়ে ব'সে মনের চিন্তারাশিকে মস্তিষ্কের মধ্যে আনবার চেষ্টা

করছিলাম। কাঁধে মৃত্নু স্পর্শ অনুভব করে চোখ ফিরিয়ে দেখ্লাম—নতুন রক্ষী। সে-ঘরে শুধু আমি আর সে। যতদূর মনে পড়ে, সে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, অপরাধী, তোমার মনে কি দয়া আছে ?

—না···

সে ঘাবড়ে গেল আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরে। তবু সে বললো, তা'তে দোষের কিছু নেই। মনের আনন্দের জন্য লোকে কি কোন হীন কাজ করে না ?

কেন কর্বে না ? এ ছাড়া যদি তোমার আর কিছু বক্তব্য না থাকে আমায় একা থাক্তে দাও। তোমার কি উদ্দেশ্য বল।

ক্ষমা কর আমায়। তোমায় শুধু দু'টি কথা বল্বো। ধর, তুমি যদি কোন গরীবের উপকার করতে পার, অবশ্যি তোমার নিজের কোন হানি না করে, তবে তুমি কি তা করবে না ?

শিউরে উঠ্লাম। বললাম, তুমি কি পাগলা গারদ থেকে আসছ ? বেশ লোক বেছে নিয়েছ যা'হোক্। ভাবছ, আমি যে-কোন লোকের উপকার করতে পারি। একথা কেন ভুলে যাচ্ছ—আমি যে বঞ্চিত সে-সৌভাগ্য থেকে।

নরম হয়ে এলো তার স্বর। বল্লে, সৌভাগ্য ! হ্যাঁ, সৌভাগ্যই বটে। তোমার পক্ষে এখনও যতদূর সম্ভব আমি তার বেশি কিছু চাইছি না। গরীব পাহারাওয়ালা আমি। কাজের তুলনায় সামান্য আমার বেতন। জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। একটাকা হেরে দু'টাকা খেলেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত

একটি পয়সা পাবার সৌভাগ্যও হয়নি। শুধু অল্পের জন্য! সে-বার ৭৬ নম্বরের টিকিট কিনেছিলাম—প্রাইজ পেলো ৭৭ নম্বর। লটারী—বার বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বৃথা! ···আর একটু ধৈর্য ধর। শেষ হয়ে এসেছে আমার কথা! এই আমার সুবর্ণ সুযোগ! রাগ করোনা আমার ওপর। বোধ হয়—তুমি আজ যাচ্ছ। সবাই বলে, যারা এ ভাবে মরে, তারা লটারীর নম্বরটি ঠিক দেখতে পায়। কথা দাও, কাল সন্ধ্যায় তোমার প্রেতাত্মা আমার কাছে এসে আমায় অন্ততঃ তিনটি নম্বর বলে দেবে! ভূতের ভয় আমার নেই। তুমি সেজন্য ভেবোনা। এই আমার ঠিকানা···তুমি তো অনায়াসেই আমায় চিন্‌তে পারবে। পার তো আজ সন্ধ্যেয় এসো···

মনে যদি একটা উন্মাদ চিন্তা আসতো তবে আমি সাহসই করতাম না বিকারগ্রস্ত এই লোকটির কথার কোন জবাব দিতে। আমি ছিলাম যে নিরাশ অবস্থায় সে-অবস্থায় চুল দিয়ে শিকল ছিঁড়বার অসম্ভব কল্পনাও মনে জাগে। মুমূর্ষু শয়তানের মতো বল্‌লাম, আমি তোমায় রাজার মতো ধনী করবো, কোটি টাকা লাভ করিয়ে দোব—কিন্তু এক সর্তে—। চোখ দুটি ডাগর হলো আশায়। সে বললো, কি সর্তে?

তিনটির বদলে আমি তোমায় চারটি লটারীর নম্বর বলে দেবো। তুমি আমার সঙ্গে পোষাক বদল কর।

পোষাকের বোতাম খুলতে খুলতে সে বললো, শুধু এই—বেশ!

চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লাম। সাগ্রহে লক্ষ্য করলাম তার

গতিবিধি। বুক কাঁপলো। রক্ষীর পোষাকের বোতাম খোলা হ'বার আগেই খুলে গেল আমার কক্ষের দরজা।

ঘুরে দাঁড়ালো সে। ইতস্ততঃ করে বললে ও, শুধু এই? কিন্তু তুমি এখান থেকে বাইরে যেতে পারবে না।...

জানতাম—আমার সকল আশা শেষ হয়েছে। তবু, ভাবলাম—আর একবার চেষ্টা করবো—অর্থহীন—নির্বোধের নিস্ফল অকারণ চেষ্টা!

বললাম, হ্যাঁ, তা'তে কি আসে যায়? তোমার সৌভাগ্য যে গড়া হয়ে যাবে। বাধা দিয়ে সে বললো, আহা—আইন—না। আমার নম্বরের জন্য। তুমি যদি মর তা'হলেই যে নম্বরগুলো ঠিক বলতে পারবে। আত্মসংবৃত হবার চেষ্টা করলাম। হতাশার বাতাসে নিভে গেল মনের মাঝে লুকিয়ে-থাকা আশার ক্ষীণ আলোটুকু!

[ত্রিশ]

চোখ বুজে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে চেষ্টা করছিলাম—অতীত আর বর্তমানকে ভুলতে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো—শৈশব-যৌবনের স্মৃতি—শান্ত-সুন্দর, বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে রমণীয় একটি দ্বীপের মতো। এলোমেলো চিন্তা আলোড়িত হ'লো মনের মধ্যে। আমি যেন একটি শিশু—ছাত্র, হাস্‌ছি—খেলছি, দৌড়ছি—গির্জার সবুজ মাঠে ছেলেদের ডাকাডাকি করছি।

তারপর চার বছর পরে আর একবার সেই গির্জার ধারে গিয়েছিলাম। তখন আমি যুবক; আবেগ ও স্বপ্নেভরা আমার মন!

নিরালা ফুলবাগিচায় একটি নারী—স্পেনদেশীয় তরুণী। চোখ ছু'টি ডাগর, চুল কোঁকড়ানো, রং ফর্সা, ঠোঁট লাল, গাল গোলাপের মতো নরম, বয়স চোদ্দ—পেপি তার নাম! তার অভিভাবক আমাদের একসঙ্গে বেড়াবার সম্মতি দিয়েছিলেন। তাই বেরিয়েছিলাম আমরা। কথা বল্‌ছিলাম ছু'জনে—ছুটি তরুণ-তরুণী। মাত্র একটি বছর আগে আমরা খেলেছিলাম—একই সঙ্গে। বাগানের সব চেয়ে ভালো আতাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিলাম—পেপিটার সঙ্গে, টানাটানি করেছিলাম পাখীর বাসা নিয়ে। সুন্দর তার চোখ ছুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠেছিল। আমি বলেছিলাম, আক্কেল হয়েছে। সে তার মার কাছে নালিশ করেছিল। তিনি তাকে নিরাশ করেছিলেন ভৎসনায়।

ধীরে পথ চলতে চলতে ছু'জনে করছিলাম আলাপ। আমি তার জন্য নিয়েছিলাম ক'টি ফুল। ছু'জনের করস্পর্শে হাত কাঁপলো ছু'জনের।

সে ছোট পাখীগুলোর কথা, আমাদের মাথার ওপরের তারাগুলোর কথা, গাছের আড়ালে সূর্যাস্তের কথা কিংবা কখনও তার বান্ধবীদের কথা, তার পোষাকের কথা আমায় বলছিল। নিষ্পাপ নিষ্কলুষ আমাদের কথায় ছু'জনের মনে জাগছিল—অহেতুক লজ্জা। সেই ছোট্ট পেপি আজ বড়ো হয়েছে···

গ্রামের সন্ধ্যা ···

ছু'জনে বাগানের একপ্রান্তে একটি গাছের তলায় বসেছিলাম।

একটু নীরব থেকে সে আমার কাঁধে হাতটি লাগিয়ে বললো, এখনও তো দিনের আলো রয়েছে। বইটা একবার পড়না। সঙ্গে ছিল আমার একখানি প্রিয় বই। বইটা ধরলাম তার সাম্‌নে। একটি পাতা খুলে আমার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে আমাদের দু'জনের নিশ্বাস আর ঠোঁট দু'টি মিলিত হলো। ভেবেছিলাম—আরও কিছুক্ষণ চলবে পড়া। হঠাৎ এক খেয়াল চাপলো তার। পেপি আমায় বললো, চল, এবার একটু ছুটে আসি।

সে পা বাড়ালো—তার ছোট্ট রাঙা পা দু'খানি। পায়ে লেগে তার জামাটি সরে যাচ্ছিল বার বার। তাকে অনুসরণ করলাম, ধরলাম তার জামাটা। আবার সে দিল ছুট্।

ভুলে গিয়েছিলাম সব, হয়ে পড়েছিলাম আত্ম-বিস্মিত। তাকে একটি ভরা পুকুরের পাড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম। আলিঙ্গণাবদ্ধ করে বসালাম পুকুর-পাড়ে।

তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল—অনভ্যস্ত পরিশ্রমে। তবু মুখখানি তার হাসিতে ছিল ভরে। আমি কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবে অনিমেষ-নয়নে চেয়ে ছিলাম তার মুখের দিকে। এখানে বোস। আঁধার হয়নি এখনও। একটা গান কর না। সে আমার কোলের ওপর রাখলো মাথা, আর আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইলো গান। কোকিলের মত মধুর তার কণ্ঠস্বর।

আকাশখানি ভরে উঠ্‌লো তারায়।···

বাড়ি ফিরে বললো, মা, আজকে আমরা ছুটেছি কেমন জান?

কিছুই বললাম না আমি। মনে হলো যেন স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করে এলাম !

সে সব দিন অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে। সারাটি জীবন···!

[একত্রিশ]

ঘণ্টা বাজ্‌লো ! ঘণ্টা···জানিনা।

শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাই না আমি। মনে হয়—আমার কানের কাছে কি একটা যেন অহর্নিশ বাজছে—যেন গুন্ গুন্ কর্‌ছে আমার শেষ চিন্তাটি।

এই অন্তিম মুহূর্তে যখন অতীতের হারানো কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন মনে জাগে অনুতাপ। কি ঘোরতর পাপই না করেছি ! দণ্ডাদেশ পাবার আগে আমি মনমরা হয়েছিলাম। তখন আমার একমাত্র আকুলতা—মৃত্যুর। আমি করেছি অনুশোচনা—পূর্ণ পরিতাপ ! যখন ভাবি—আমার জীবনে কি ঘটেছে, যখন দেখি—ফাঁসির দড়িখানি চোখের সামনে ঝুলছে, তখন মনে হয়—এ যেন ভয়ঙ্কর—অভিনব এক বস্তু···আনন্দময় শৈশব, স্বপ্নমাখা যৌবন—রক্তরঞ্জিত কনক-বসনাঞ্চল !

সেই দিন আর আজকের মধ্যে বয়ে চলেছে একটি রক্ত-নদী—আমার আর একজনের রক্তের।···

দীর্ঘ দিনের আনন্দ আর অজ্ঞতার পরে এ কাহিনী যদি কেউ পাঠ করে, সে বিশ্বাসই করবে না—এই অশুভ বর্ষটি আমার শেষ হয়েছে ফাঁসিতে। হতে পারে—মানুষ নিষ্ঠুর, আইন নির্মম···কিন্তু, আমি তো তেমন ছিলাম না।

[বত্রিশ]

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ পৃথিবী থেকে আমি নেব বিদায়। অথচ একটি বছর আগে—এম্‌নি দিনে আমি ছিলাম মুক্ত, অপাপবিদ্ধ! তখন আমি উপভোগ করেছি—শরতের অনির্বচনীয় শোভা, ঝরা পাতার ওপর দিয়ে চলেছি আর পাঁচজনের মত ধীর পদবিক্ষেপে।

আজ—ঠিক এই মুহূর্তে—পাশের প্রাসাদে, নগরীর বুকে, হয়তো সবাই ব্যস্ত নিজ নিজ কর্তব্যে, কেউবা আনন্দে হাস্‌ছে, কেউবা করছে কোলাহল, আবার অনেকে মগ্ন হয়ে আছে সংবাদপত্র নিয়ে ভাবছে বসে নিজেদের ব্যবসার কথা।দোকানীরা দোকান খুলে বসে আছে, মেয়েরা সান্ধ্য-নৃত্যের আয়োজন করছে, সবাই চলেছে সারি বেঁধে, গৃহান্তরালে মা খেল্‌ছে তার শিশুর সঙ্গে—। সবাই আনন্দে মস্‌গুল···আত্মহারা···

আর আমি···

[তেত্রিশ]

আর একবার আমি এখানে এসেছিলাম—নটর-ডেম-এর প্রসিদ্ধ ঘণ্টাটি দেখতে। অন্ধকার, প্যাঁচালো সিঁড়ি দেখে চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। দু'টি প্রাচীর-তোরণ অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিলাম—সেই কক্ষে,—যেখানে ছিল সেই বৃহদাকার ঘণ্টাটি। প্যারীর সকলের পরিচিত সেই ঘণ্টাটি আগ্রহ সহকারে পরীক্ষা করতে লাগলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম—সেখান থেকে চোখে পড়ে···রাস্তার উন্মত্ত জনতা।

পিপীলিকার শ্রেণীর মতো অগণিত নরনারা !

হঠাৎ ঘণ্টা উঠলো বেজে। সেই শব্দ বাতাসের সঙ্গে উড়ে গেল—পাষাণ-প্রাচীর কাঁপিয়ে। পা পিছ্‌লে ছাতের ওপর পড়ে যাচ্ছিলাম, সেই আলোড়নে ভয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়েছিলাম নিঃশব্দে, রুদ্ধশ্বাসে। এই ভয়ঙ্কর আওয়াজ আমায় করে ফেলেছিল মুহ্যমান। চোখ পড়লো জনতার ওপর—নিচে রাস্তা বেয়ে যারা চলছিল—তা'দেরই ওপর।

বোধ হয়, আবার আমি সেখানে এসেছি। কিন্তু এখন সবই বদলে গেছে। আমার মনের মধ্যে, আমার চারিদিকে কিন্তু সেই ঘণ্টাধ্বনি অথচ চোখে পড়েনা—সেই মুখর জনতা, দেখতে পাই না জীবন—যা' ছেড়ে আমি চলে এসেছি ভয়ঙ্কর গহ্বরের মুখে !

একটা বেজে পনেরো মিনিট !···

ক্রমেই যেন আমি বেশী অস্থির হয়ে পড়ছি, অস্বস্তি বোধ করছি।

দাঁড়ালে কিংবা ঘাড় নিচু করলে মনে হয়,···আমার মাথার ভেতর একটা তরল পদার্থ বয়ে যাচ্ছে যা' আঘাত করছে আমার মাথার খুলিতে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন হঠাৎ হেঁচকা টান দিচ্ছে ! কেন জানি, যেন একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার মত আমার হাত থেকে কলমটি খসে পড়লো। ধূসর চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। সর্বাঙ্গে যেন এক নিদারুণ বেদনা বোধ করলাম।

আর দু' ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে হয়ে যাবে সব শেষ !

[চৌত্রিশ]

লোকে বলে—ও কিছুই নয় ; তা'তে মানুষ কষ্ট পায় না। এমন মৃত্যু অতি সহজ ; অস্বাভাবিক হলেও যন্ত্রণাহীন। তবে, ছ' সপ্তাহের এ নির্যাতন, সারাদিনের মরণ-যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ !

এই অপ্রতীকার্য দিন, যা' এত ধীরে, এত তাড়াতাড়ি চলে যায়,—কি তার বেদনা ? এই বেদনার সিঁড়ি—ফাঁসিমঞ্চ যার শেষ-সীমানা—সে কেমন···স্পষ্টতঃ, কেউ কি কষ্ট পায়না সেখানে ?

যখন মাথায় রক্ত উঠে যায়, অথবা মনখানি নিষ্প্রভ হয়—চিন্তার পর চিন্তায়, তখন কি কোন স্নায়'বিক আক্ষেপ হয়না ?

মানুষের কোন কষ্ট হয়না তাই ! এ সম্বন্ধে মানুষ কি নিশ্চিত ? কে তাকে বলেছে এ কথা ?

কেউ কি কখনও শুনেছে—প্রাণহীন দেহ শবাধার থেকে লাফিয়ে উঠে' জনতাকে বলেছে—আমার লাগেনি। কোন মৃতের আত্মা কি কাউকে ধন্যবাদ জানিয়েছে—এ আবিষ্কার আশ্চর্য, অভিনব, নিখুঁত তার গঠনকৌশল ? না, কিছু নয়।

এক মিনিট, এক সেকেণ্ড কিংবা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে সমাধা হয়ে যায় কাজ। কেউ কি কখনও চিন্তা করেছে—সামান্য একগাছি রজ্জু এক মুহূর্তে রুদ্ধ করতে পারে মানুষের শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া ?

আধ সেকেণ্ড্ ! যন্ত্রণার উপশম ! ভয় !

[পঁয়ত্রিশ]

সুধু ভাবি সম্রাটের কথা, বৃথাই আমি ভুল্‌তে চেষ্টা করি তাঁকে। সকল সময় কানে কানে দরজায় সশস্ত্র প্রহরী বলে যায়—এই নগরীর বাইরে, এই সময়ে অনতিদূরে আছেন একজন লোক! তোমারই মতো মানুষ তিনি। প্রভেদ সুধু এই—তিনি বড় আর তুমি ছোট। তাঁর সারাটি জীবন বিজয়, জাঁক-জমক, আমোদ-আহ্লাদে পূর্ণ। তাঁকে ঘিরে রয়েছে —ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রতিপত্তি। তিনি যখন কথা বলেন, তখন চারদিকে সবাই থাকে নীরব, সকলেই হয় উৎকন, আর গর্বিত ব্যক্তির শির হয় অবনত।

এখন তিনি মন্ত্রীসভায়! মন্ত্রীরা তাঁর মতে সায় দেবে। হয়তো তিনি কাল শিকারের অথবা সান্ধ্য-নৃত্যের কথা ভাবছেন। তিনি জানেন—কোন আমোদের ব্যবস্থা হ'লে, সে-খবর তাঁর কাছে বিজ্ঞাপিত হবে যথাসময়ে—আনুষঙ্গিক পরিশ্রমটা পড়বে অন্যের ঘাড়ে। কিন্তু তিনিও রক্ত-মাংসে গড়া, ঠিক তোমারই মতো। এখন—এই মুহূর্তেও মৃত্যু-বিভীষিকা দূর হ'তে পারে। তিনি তোমায় দিতে পারেন জীবন, স্বাধীনতা, সৌভাগ্য! কাগজের উপর তাঁর একটিমাত্র স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করে তোমার জীবন-মরণ! তিনি অনায়াসে তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারেন তোমার পরিবারের কাছে। দয়ালু তিনি ···এ অনুকম্পা দেখিয়ে তিনি নিশ্চয় আনন্দ পেতেন সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তা'-যে হবার নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ খবর তিনি জানেন না, জান্‌তে পারেন না!

[ছত্রিশ]

বেশ! আমি সঞ্চয় করবো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস।

মৃত্যু!···তাকে জিজ্ঞাসা করবো—সে কি, কি সে চায়? তার প্রতিটি অংশ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে একবার দেখবো—কবরের ভেতর উঁকি মেরে।

—চোখ দু'টো মুদ্রিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনার দৃষ্টিতে দেখি—উজ্জ্বল আলোক আর একটি জ্যোতির্ময় গহ্বর—যেখানে চিরদিন ভ্রমণ করবে আমার মন। ভাবি—আকাশ হবে একটি জ্যোতিষ্ক যা'র উপর তারাগুলো দেখাবে এক একটি কালো চিহ্নের মতো। অথবা, আমি—ভাগ্যহীন আমি হয়তো পড়বো—দুস্তর দুরতিক্রম্য, দু'দিক্ কালোয় ঢাকা সমুদ্রে। দেখবো—তার জলে অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি বেড়াচ্ছে ঘুরে। কিংবা, ফাঁসির রজ্জু খুলে ফেল্‌বার পর আমি হয়তো এক আর্দ্র ভূমিতে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মর্‌বো। হঠাৎ প্রমত্ত বাতাসে আমি যাবো উড়ে,—ঘুরবো ইতস্ততঃ। পথের মাঝে দেখতে পাবো—কৃষ্ণবর্ণ, মসীমাখা! গরম জলের নদী—চোখ তুলে দেখবো—শুধু আঁধারের সমুদ্র—তার ঘন স্তর দূরে—বহুদূরে—আঁধাবের চেয়েও গভীর জমাট ধূমল। আমার চোখ দু'টো আঁধারের মধ্যে আবিষ্কার করবে—লাল কণা,—যেন এক ঝাঁক আগুনের পাখি! চিরদিন—অনন্ত কাল ধরে' সেই একই দৃশ্য!···

মাঝে মাঝে শীতের রাতে আমারই মতো মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্তদের

সঙ্গে দেখা হবে আমার। বিষণ্ণ, রক্তাক্ত সেই লোকগুলো! আমি তাদেরই একজন। চাঁদের আলোর প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো—চুপি চুপি। টাউনহলখানি তার জীর্ণ নির্মম মূর্তিতে ভেসে উঠ্‌বে আমার দৃষ্টির সম্মুখে, চোখের উপর ভাস্‌বে—ফাঁসির রজ্জুটি—দোদুল্যমান। দেখবো—শয়তান জল্লাদকে ফাঁসি দিচ্ছে, কৌতূহলী দর্শকদের সঙ্গে মিশে আছি আমরা সবাই।

এমন হওয়া সম্ভব। কিন্তু মৃতব্যক্তিরা যদি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়, তবে তারা কোন্ মূর্তিতে আসে···কি আকার হবে তাদের অসমাপ্ত, বিকৃত দেহগুলোর···কেমন হবে তাদের বেশ··· মরণ কি আমাদের আত্মার কোন পরিবর্তন ঘটায়? আত্মাকে দিয়ে যায় কি প্রাকৃতিক আকার, কি সে নেয় আমাদের কাছ থেকে! ··কোথায় সে রাখে অপহৃত বস্তুটি?

উগ্র কল্পনাময় মনখানি বিভ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি চিন্তা করেছি—মৃত্যু আর অনন্তকাল সম্বন্ধে।

যাজক!

তিনি তা' জানেন। আমি একজন যাজককে চাই, শুন্‌তে চাই তাঁর উপদেশ! আমি চাই—সত্যিকারের একজন যাজক। তাঁর কাছে শুন্‌বো উপদেশবাণী। আমার দরকার—একজন যাজক, আর একটি ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টমূর্তি। আমি চাই—তাঁদের আলিঙ্গন করতে···এই—এই সেই যাজক!

[সায়ত্রিশ]

শুয়েছি—যথারীতি অনুমতি নিয়ে।

তন্দ্রা এসেছে আঁখি জুড়ে।

হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখলাম !···গভীর রাত্রি। দু'জন বন্ধুর সাথে বসে আছি। মনে আসে না—বন্ধুদের নাম। আমাব স্ত্রী ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে—শিশুটিকে বুকে নিয়ে। আলোচনা শুরু করলাম—একটি গোপন বিষয়। ভয় হচ্ছিল—পাছে কেউ শুনে ফেলে আমাদের কথা।

পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো—একটি অস্পষ্ট কোমল শব্দ। বন্ধুদের-ও কানে গেল—সেই শব্দটি। শুনলাম কান পেতে। এ যেন তালায় চাবি ঘোরাবার কিংবা লৌহশলাকায় আঘাতের আওয়াজ !

চমকে উঠলাম আমবা। ভাবলাম—সিঁদেল চোর ঢুকেছে বাড়িতে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লাম—চোব ধরবোই। একখানি মোমবাতি জ্বালিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম। বন্ধুরা করলো—আমার অনুসরণ।

পাশের ঘরটিতে প্রবেশ করে দেখি—বুকে ঘুমন্ত শিশু নিয়ে পত্নী আমার গভীর নিদ্রামগ্ন। সেখানে কিছু নেই, কেউ নেই।

বৈঠকখানা আর খাবারঘরের দরজাগুলো যেন একটু নড়চড় হয়েছে। খাবার ঘরখানি তালাস করলাম। আমিই চলেছি আগে আগে। সিঁড়ির দরজা ও জানালাগুলো ছিল বন্ধ, চুল্লীর কাছে গিয়ে দেখলাম, আলমারির একখানি পাট খোলা, দরজাখানি কোণাকৃতি হয়ে আছে। মনে হলো, কে যেন আছে লুকিয়ে।

হাত বাড়ালাম—দরজাখানি বন্ধ করতে। কিন্তু দরজাটি যেন আটকানো। বিস্মিত হ'য়ে টান দিলাম জোরে। দরজাটি চলে এলো। দেখলাম—একটি বৃদ্ধা ; তার হাত দু'টো ঝুলছে, চোখ বাঁধা, যেন দরজার সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা। ভয়াবহ বিকট সেই মূর্তি। সেকথা ভাবতেই কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার শরীর। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি ? কোন উত্তর পেলাম না। আবার বললাম—কে তুমি ? সে নিরুত্তর, পলকহীন তার দু'টি চোখের তারা।

বন্ধুরা বললো—এটা হচ্ছে চোর-ডাকাতদের সঙ্গী। ওরা পালিয়েছে আমাদের আসতে দেখে। এ' পালাবার সময় না পেয়ে এখানে লুকিয়ে আছে।

আবাব প্রশ্ন করলাম। তবু মূর্তিটি রইলো নীরব, অনড়, নিমীলিত-নয়ন। বন্ধুদের একজন তাকে মারলো একটি ধাক্কা। —সে পড়ে গেল—সোজা—একটি খুঁটির মতো—মড়ার মতো। দাঁড় করিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলাম তাকে। তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পেলোনা। তার কাঁধের উপর মুখ রেখে চেঁচালো আমার বন্ধু। তবু সে নির্বাক—যেন সে কালা !···ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো আমাদের।

বন্ধু বললো—মোমবাতিটা তার চিবুকের নিচে রাখ।

তাই করলাম।

অর্ধ-উন্মীলিত করলো সে তার চোখ দু'টো।

বাতিটি সরিয়ে নিয়ে বললাম—এখন দেখছি তুমি কথা বলবে। বল তো, কে তুমি ? আবার বুজে গেল তার দু'টি চোখ।

এবার গরম লাগাও—আবার দাও—সে কথা বলবেই—জোর দিয়ে বল্‌লো আমার বন্ধু।···আবার আলোটি ধরলাম তার চিবুকের নিচে। সে চোখ খুল্‌লো। দেখ্‌লো আমাদের একে একে। তার নিশ্বাসে বাতি গেল নিভে। সেই অন্ধকারে তিনটি ধারালো দাঁত যেন বিদ্ধ করলো—আমার হাতখানি।

জেগে উঠ্‌লাম! ভয়ে সর্বশরীর হয়েছিল ঘর্মসিক্ত।

আমার শয্যার অদূরে উপবিষ্ট রক্ষী পাঠ কর্‌ছিল একখানি ধর্ম গ্রন্থ।

জিগ্যেস করলাম—আমি কি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি? বোধ হয়, ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছ। তোমার মেয়েটিকে এখানে আনা হয়েছে। পাশের ঘরে তোমারই জন্য অপেক্ষায় আছে সে। তাঁদের আমি বারণ করেছিলাম—তোমায় জাগাতে।

আমার মেয়ে! ওঃ···আমার মেরী ··মেরি! তাকে আমার কাছে আসতে দাও।

[আটত্রিশ]

উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ, ডাগর দু'টি চোখ। এত সুশ্রী সে। তার পোষাকটিতে তাকে মানিয়েছে চমৎকার। হাত ধরে টেনে নিয়ে হাঁটুর উপর বসালাম, তার মুখে দিলাম চুম্বন। জিগ্যেস কর্‌লাম, তোর মা আসেনি? জানলাম, তার অসুখ; তার দিদিমা—আমার অভাগিনী বৃদ্ধা মা-ও অসুস্থ।

মেরী অবাক্ হয়ে চাইলো আমার পানে। আমার আদর, আলিঙ্গন আর অজস্র চুম্বনে সে করেছিল আত্মসমর্পণ; কিন্তু মাঝে মাঝে দেখ্‌ছিল তার নার্স-এর দিকে।

অদূরে এক কোণায় দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছ্‌ছিল সে—বেচারী।

মেরী···মেরী! ছোট্ট আমার মেরী!—তাকে বুকে চেপে ধরলাম জোরে। সে কেঁদে উঠে বললো, আমায় ব্যথা দিচ্ছ কেন, মশায়?

"মশায়!"···

প্রায় একটি বছর আগে আমায় সে দেখেছে। আমায় ভুলে গেছে সে। ভুলেছে আমার মুখ,—ভাষা, কণ্ঠস্বর। আর তা'ছাড়া আমার এই লম্বা দাড়ি আর কয়েদীর পোষাক, এই কদর্য মুখ দেখে সে আমায় চিন্‌বেই বা কেমন করে?

হ্যাঁ?···যার মধ্যে আমি বেঁচে থাকবো আশা করেছিলাম, সে-ও আমায় মন থেকে দিয়েছে নির্বাসন। আমি আর পিতা নই। শিশু-কণ্ঠের সেই দুর্লভ করুণ-কোমল 'বাবা' ডাক আমি আর শুন্‌বো না! তার কণ্ঠের 'বাবা' ডাক যদি একটিবারও আর শুন্‌তে পেতাম! চল্লিশ বছরের যে জীবন থেকে আমি আজ হ'তে চলেছি বঞ্চিত, তার বিনিময়েও যদি আমি সেই ছোট্ট মুখ থেকে শুন্‌তে পেতাম ওই সু-মধুর কণ্ঠের বাবা সম্বোধন!···

তার ছোট্ট হাতখানি আমার হাতের ভেতর নিয়ে বল্‌লাম—শোন মেরী! তুমি কি সত্যিই আমায় চেননা? অবাক হয়ে সে চাইলো আমার দিকে। বল্‌লে—না।

ভাল করে তাকিয়ে দেখ—চিনতে পার কি না ?

হ্যাঁ মশায়, তুমি একজন ভদ্রলোক আর কি !

যাকে আমি আমার সকল প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, যাকে পেতে চাই সর্বদা আমার কাছে, দেখ্‌তে চাই—সে চিন্‌ছে না আমায়। কেমন ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে দিচ্ছে আমার প্রশ্নের জবাব। সে আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে না। সে জানেনা—আমি মরতে বসেছি, আমার সান্ত্বনার প্রয়োজন !

—মেরি, তোর কি বাবা আছে···

—হ্যাঁ, আছে বৈকি।

—বেশ—। তিনি এখন কোথায় ?

অবাক্ হয়ে তার ডাগর দুটি চোখ তুলে চাইলো আমার দিকে। বললো—তুমি বুঝি জাননা ? আমার বাবা মরে গেছে ! অশ্রু···ছলছল হলো তার দুটি আঁখি। সে কাঁদতে লাগলো। মনে হলো—সেই ছোট্ট দেবশিশুটিকে যেন আমি নামিয়ে এনেছি নরকে।

—মরে গেছে ? তুমি কি জান, মেরী—মরণ কি ?

—হ্যাঁ, আমার বাবা মাটির নিচে—স্বর্গে। আমি মার কোলে বসে রোজ সকাল-সন্ধ্যা ঈশ্বরের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করি।

বল্‌লাম, কি প্রার্থনা কর আমায় বলনা একবার।

একটি স্নেহচুম্বন দিলাম তার কপালে।

—না, দিন-দুপুরে প্রার্থনা করতে নেই। আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি যেয়ো, তখন শুনতে পাবে।

—মেরী—মেরী—আমি···আমিই যে তোমার বাবা !

য়ঁ্যা···তুমি ! প্রশ্ন করলো সে।

বললাম—তুমি আমায় কি তোমার বাবার মতো ভালবাসবে তা'হলে ?

না—আমার বাবা দেখ্‌তে তোমার চেয়ে ঢের স্থন্দর ছিল···

তার সর্বাঙ্গ ভরিয়ে দিতে লাগলাম চুম্বনে, আর অশ্রুতে সে কেঁদে আমার কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

তোমার দাড়িগুলোয় আমার লাগছে যে !

তাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে একদৃষ্টে তার মুখের পানে চেয়ে জিগ্যেস করলাম, তুমি পড়তে পার মেরী ?

হ্যাঁ—খুব পারি। মা'র কাছে আমি পড়ি।

আচ্ছা বেশ···, আমার কাছে পড় দেখি। তার হাতে গুটানো কাগজটি তারই সামনে ধরলাম।

ঘাড় নেড়ে সে বললো,···আমি গল্পের বই পড়তে পারি স্থধু।

একবার চেষ্টা করে দেখ। এসো, তোমার কাগজটি একবার খোল।

কাগজখানি খুলে সে পড়লো মর-ণ···মরণ···দ-ন্‌-ডা-জ্ঞা ···দণ্ডাজ্ঞা !···

তার হাত থেকে তুলে নিলাম কাগজখানি।

সে আমায় পড়ে শোনাচ্ছিল···আমার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ! তার নার্স এক পয়সা দিয়ে রাস্তায় কাগজখানি কিনেছিল। সেটিই ছিল তার হাতে।

অসহ্য! প্রকাশ করতে পারছি না—আমার তখনকার মনের ভাব।

সে ভয় পেয়েছিল আমার অত্যাচারে। অশ্রু-সজল হয়েছিল তার দুটি চোখ। বললো, ফিরিয়ে দাও আমার কাগজখানি। ওটা দিয়ে আমি 'নৌকা' গড়বো···

কাগজখানি ফিরিয়ে দিলাম। নার্সকে বললাম, একে নিয়ে যাও। তারপর চেয়ারে বসে পড়লাম···একা, বিষণ্ণ হতাশ হয়ে!···

এখনই আসতে পারে ওরা। আর কিছু বলবাব বা করবার কিছু নেই। হৃদয়েব শেষ তন্ত্রীটি গেছে ছিন্ন হয়ে। যেই আসুক না কেন, আমি প্রস্তুত!

[উনচল্লিশ]

যাজক আর জেলাব···দুজনেই দয়ালু। আমার মেয়েটিকে বিদায়-মুহূর্তে তাঁদের চোখেও দেখা দিয়েছিল—অশ্রু।

সে-কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি সুধু চিন্তা কবতে পারি—জল্লাদ—গাড়ি—রক্ষী—জানালায় কৌতূহলী জনতা।

উন্মত্ত আকুল জনারণ্যের সম্মুখে আমায় ফেলতে হবে শেষ নিঃশ্বাস। সম্ভবতঃ আরো একঘণ্টা সময় আমার আছে—ভাববার।

সবাই হাসবে, হাততালি দেবে বাহবা দেবে, আর এ'সব স্বাধীন লোক, যারা জেলারকে জানেনা, যারা আকুল উত্তেজনা নিয়ে ফাঁসির তামাসা দেখতে আসে, তাদের উল্লাসধ্বনির সঙ্গে একটি লাল আধারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে আমার দেহখানি।

যারা কৌতূহলপরবশ হয়ে এসেছে আমায় দেখতে, তাদের মধ্যেও নিশ্চয় এমন লোক থাকবে যারা একদিন আমারই মতো ফাঁসিমঞ্চে হারাবে প্রাণ !

আমারই জন্য আজ এখানে যারা এলো, তাদের কয়েকজনকে হয়তো আসতে হবে আবার, এখানে—নিজেরই জন্য।

[চল্লিশ]

আমার ছোট্ট মেয়ে মেরী। তাকে তারা নিয়ে গেছে খেলতে।

সে তার বাড়ির জানালা দিয়ে তাকাবে—উন্মাদ জনতার দিকে। জেলে-দেখা 'ভদ্রলোক'টির কথা সে আর চিন্তা করবেনা নিশ্চয়।

তার জন্য ক'লাইন লিখে যাবার সময় হয়তো এখনও আমার আছে। পনেরো বছর পরে সেই লেখাটি পড়ে সে যেন চোখের জল ফেলতে পারে—আজকের দিনের এ বেদনার জন্য। হ্যাঁ। আমার কথা তাকে বলা প্রয়োজন। তার জানা দরকার—আমারই দেওয়া তার নামটি কেন হয়েছে কলঙ্কিত !

আমার কথা—

সম্পাদকের দপ্তর···লেখা আছে অসমাপ্ত

[বাকীটুকু খুঁজে পাওয়া যায়নি, হয়তো দণ্ডিত অপরাধীর আর লেখবার সময় ছিল না। এ চিন্তা হয়তো অনেক দেরীতে এসেছিল তার মনে]

[একচল্লিশ]

টাউন-হল-এ—

হ্যাঁ, আমি এখানে। শেষ হয়েছে আমার অভিশপ্ত যাত্রা। হয়তো সামনেই ফাঁসির মঞ্চ—যেন চেয়ে আছে আমারই দিকে, আমায় ডাকছে ইসারায়। জানালার নিচে বিরাট জনতা হাসছে, কোলাহল করছে, অপেক্ষা করে আছে আমারই জন্য।

নিজেকে সংযত করতে এতটুকু কষ্ট হ'ল আমার। আমার অন্তর গেল উড়ে—'যখন দেখলাম—জনতার মাথার ওপরে সেই ফাঁসিমঞ্চ! সাহস ছেড়ে গেল আমায়।

শেষ বক্তব্যপ্রকাশের অনুমতি চাইলাম আমি। তাই তারা আমায় এখানে এনে রেখে খুঁজতে গেছে সরকারী কৌঁস্ুলীকে। আমিও অপেক্ষা করে আছি তাঁর। এই সময়টুকু-ও কম মূল্যবান নয় আমার কাছে।

তিনটা বাজলো। আমায় জানানো হ'ল—সময় হয়েছে।

ছ'ঘণ্টা ধরে আর কোন চিন্তা করিনি। তবু, আমি কেঁপে উঠলাম।

ছয় সপ্তাহ···ছ'মাস!

অপ্রত্যাশিত-ভাবেই যেন এলো—সেই চরমক্ষণ!···তারা আমায় বারান্দার ভেতর দিয়ে, সিঁড়ির নিচ দিয়ে নিয়ে এলো। নিচের ঘরের ছুটি ছোট দরজার মধ্য দিয়ে ঠেলে দিলে—একটি ক্ষীণালোক ঘরে। ঘরের মাঝখানে একখানি চেয়ারে বসানো হল আমায়।

ক'জন লোক দরজার কাছে, দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছিল। যাজক আর রক্ষী ছাড়া সেখানে ছিল আরও তিন ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একজন খুব বলিষ্ঠ। সেই লোকটিই—উঃ-! সে-ই জল্লাদ। বাকী দু'জন তার সহকারী। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে তারা করছে আমার অনুসরণ।

হঠাৎ চুলের গোড়ায় ইস্পাতের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেলাম। কানের কাছে কাঁচির শব্দ—খচ্-খচ্! স্তূপাকার হ'য়ে কাঁধের ওপর পড়লো আমার কাটা চুল। জল্লাদ তার কঠিন হাত দিয়ে কুড়াতে লাগলো সেগুলো।

আমার চারদিকে সবাই নিঃশ্বাস ফেলছে ধীরে, কথা বলছে ফিস্ ফিস্ করে।

বাইরে সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো ভয়ানক একটা শব্দ শুনে প্রথমটা ভাবলাম—নদীর কলশব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু হাসির লহরে বুঝলাম—এ জনতারই কোলাহল···

জানালার কাছে বসে একটি লোক 'নোট' বুকে কি যেন লিখছিল পেন্সিল দিয়ে।

তোমাদের এ কাজকে কি বলে! একজন সহকারীকে জিগেস করলো সে।

উত্তর পেলো···মৃত্যু-পথ-যাত্রীর প্রসাধন। বুঝলাম—লোকটি আগামী দিনের সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করছে।

জল্লাদের একজন সহকারী খুলে নিল আমার গায়ের কোটটি, আর একজন দুখানি হাত পিঠের উপর নিয়ে রজ্জুবদ্ধ করলো।

আর একটি লোক গলাবন্ধটা খুলে ফেললো। শার্টটি ছাড়া আর কিছু রইল না গায়ে।

বেড়ি কাটা হলো। একটু ইতস্ততঃ করে জল্লাদের একজন সহকারী আমার মূল্যবান শার্টটির "কলার" কাটতে আরম্ভ করলো।

এই অপ্রত্যাশিত, অপ্রয়োজনায় সতর্কতায়, ইস্পাতের শীতলতায় বুক কাঁপতে লাগলো দুরু দুরু করে। মুখ থেকে অর্দ্ধস্ফুট একটি শব্দ বেরিয়ে এলো। জল্লাদের হাত কাঁপছে।

ক্ষমা করুন মশায়, লেগেছে কি? জল্লাদেরা দেখছি খুব বিনয়ী।

বাইরে জনতা শুরু করেছে কোলাহল। প্রধান জল্লাদ ভিনিগার মাখা একটা রুমাল দিয়ে আমায় বললো···এটা শুঁকুন।

দৃঢ়-কণ্ঠে বললাম···ধন্যবাদ, তার দরকার নেই। বেশ আছি।

একটি লোক হাঁটু গেড়ে বসে আমার পা দুটি একত্র করে বাঁধলো দড়ি দিয়ে। দড়িখানি টানা দেওয়া হোল আমার হাতের সঙ্গে। তারপর সে দড়িটি ফেলে দিল আমার পিঠের ওপর। দস্তুরমত সবই ঠিক হলো। যাজক এলেন হাতে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটি মূর্তি। বললেন···বৎস, এবার চল।

চললাম! পায়ের রজ্জুটি কষে বাঁধা হয়নি তখনও। পা কাঁপছিল মনে হচ্ছিল—প্রত্যেক পায়ে যেন দুটো করে জানু।

বাইরের দরজাগুলো খোলা হলো। আঁধারের মধ্যে, ছায়ার মধ্যে দেখতে পেলাম—উজ্জ্বল আলোক, শুনলাম জনতার চিৎকার, অনুভব করলাম শীতল বাতাসের স্পর্শ। দেখলাম—

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে কত লোক ; ডাইনে—একটি সমতল যায়গায় অশ্বারোহী সশস্ত্র সেনাদল অপেক্ষমাণ। বাঁয়—একখানি শকটের পশ্চাৎভাগ···তার সঙ্গে জোড়া একটি মই। ভয়ঙ্কর··· ভয়াবহ একটি দৃশ্য। কাবাগারেরই অনুরূপ।

এ সময়টার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলাম সাহস। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম।

ঐ—ঐ, জনতা চিৎকাব করলো, ঐ সে এলো।

হাততালি দিয়ে উঠ্‌লো যারা ছিল কাছে। প্রজানুরঞ্জক রাজাকে দেখলেও প্রজারা এমন আকুল উল্লাসিত হয়না।

অতি সাধারণ একখানি শকট। ঘোড়াগুলো যেন এসেছে ম্যালেরিয়ার দেশ থেকে। অদ্ভুত গাড়োয়ানের চেহারাটি। জল্লাদ উঠ্‌লো আগে। তার সঙ্গে গেল একজন সহকারী।

"নমস্কার মিঃ স্যাম্পসন"—যাবা রেলিং-এ দাঁড়িয়েছিল তারা বল্‌লো।

ছেলের দল চিৎকার করে উঠলো।

সাম্‌নের বেঞ্চিতে বস্‌লো ওরা দুজনে।

এবার আমার পালা। উঠ্‌লাম অবিচলিত ভাবে।

'বেশ দেখাচ্ছে ওকে'—রক্ষীদের পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌লো একটি নারী।

এই উদ্ধত অবজ্ঞা ফিরিয়ে আনলো আমার মনের বল। যাজক বসলেন আমার পাশে। শিউরে উঠ্‌লাম আমি, শেষ অনুকম্পায়। এতে যেন রয়েছে খানিকটা মনুষ্যত্যের ছাপ।

তবে তাদেরও মনুষ্যত্য আছে···চারদিকে তাকিয়ে দেখি।

সামনে পিছনে সান্ত্রী, তারপর জনতা—আবার জনতা—সুধু নরমুণ্ডের সমুদ্র।

জেলখানার দরজায় অশ্বারোহী সৈনিক আমারই অপেক্ষায় ছিল। ফটক পেরিয়ে এলাম। গাড়িখানি কাছে আসতেই ঘণ্টা বাজলো। নিখিলের মর্মকথা ধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই ঘণ্টাধ্বনিতে।

সবাই শির অবনত করলো—অশ্বারোহীদের আদেশে। যাজককে বল্‌লাম…ওরা শির নোয়াচ্ছে, আমি কিন্তু তুল্‌ছি…

ফুলের দোকান। গন্ধে আমোদিত হচ্ছে চারদিক। দোকান ফেলে এসে ফুলওয়ালা দাঁড়িয়েছে আমায় দেখতে।

তারপর কয়েকটি মণিহারী দোকান। সেখানে মেয়েদের ভিড়। দালাল লম্পটদের আজ হয়তো একটা সুখের দিন। তারা চেয়ার, টেবিল, গাড়ি ভাড়া করে এনেছে—পয়সা রোজগারের জন্য। সবাই ব্যগ্র—এ দৃশ্য দেখতে। যারা মানুষের রক্ত নিয়ে ব্যবসা করে তারা উঁচু গলায় বলছে…যায়গা চাই—যায়গা চাই ?

রাগ হলো আমার তাদের ওপর। ইচ্ছা হলো বলি… যায়গার আবার কি দরকার ?…

গাড়ি চললো। তার পেছনে জনতা বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পেছন ফিরে দেখলাম, একটি গম্বুজ। যাজককে জিজ্ঞাসা করলাম…এটা কি ?

একটি সমাধি মন্দির।

চিনতেই পারিনি সেটা। সবই আমি দেখেছি, কিন্তু বর্ণনা

করার শক্তি নেই আমার।

অতি কষ্টে ভিড় ছাড়িয়ে টাউন হলের পথ অতিক্রম করেছি অর্দ্ধেক। ভয়ার্ত মন। ভাবলাম আত্মবিস্মৃত হবার চেষ্টা কর্‌বো, দেখবো না এ দৃশ্য, শুন্‌বো না কারো কোন কথা, সুধু যাজকের ধর্মোপদেশ ছাড়া। গোলমালে তাঁর কথাও শুন্‌তে পাচ্ছিলাম না।

ভগবান্ ক্ষমা কর আমায়,···রক্ষা কর আমায়! সুধু এ চিন্তায় মগ্ন হবার চেষ্টা করলাম আমি।

শরীর কাঁপলো গাড়ির ঝাকুনিতে। ঠাণ্ডা বোধ করলাম হঠাৎ। দেখি বৃষ্টিতে কাপড় ভিজে গেছে, জল পড়ছে গা বেয়ে।

যাজক জিজ্ঞেস করলেন···তুমি কি শীতে কাঁপছ?

হ্যাঁ, তবে সুধু শীতে নয়!

আরও কিছুদূর অগ্রসর হলাম। ক'জন স্ত্রীলোক আমায় দেখে সহানুভূতির সুরে বল্‌লো···এর বয়স এখনও একেবারে কাঁচা···

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কিছুই দেখতে বা শুনতে পাই না কোলাহলে—রাস্তায় নরমুণ্ড শুধু!

নেশাখোরের মতো হতবাক হয়ে পড়ে আছি। অসহ্য—সকলের এই উৎসুক দৃষ্টি।

মনের গতি ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে।

সেখানে—সেই কারাগারে আবদ্ধ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর, আনন্দধ্বনি, হাসির রব—এদের মধ্যে কোন প্রভেদই নির্ণয় করতে পার্‌লাম না।

চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো—একটি দোকানের ছবি। ইচ্ছা হলো—একবার দেখি—কোন দিক্‌ দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পার্‌লাম না। শরীর হয়ে গেছে অবশ, মাথা ধরেছে। বাক্‌শক্তি হয়েছি রহিত। এ যেন মৃত্যুর পূর্বাস্বাদন।

মাত্র একখানি প্রাসাদ চোখে পড়েছে। তার ছাদের ওপর উদগ্রীব নরনারীর মেলা।

গাড়ি চললো। লোকগুলো হাসছে,...কথা বলছে...হাঁটছে।

আমি বিচরণ করছি—যেন কল্পনা রাজ্যে। দোকানের ছবি দৃষ্টিবহির্ভূত হোল। কলরব আরো স্পষ্ট—তীব্রতর হয়ে উঠ্‌লো। গাড়ি থাম্‌লো। চোখে পড়লো—ফাঁসিমঞ্চ!

যাজক বললেন...সাহস হারিয়ো না।

মই লাগানো হলো গাড়ির পেছনে। যাজকের বাহুতে ভর করে এক পা নামলাম, দ্বিতীয় পদক্ষেপের শক্তি হারিয়ে ফেললাম। রাস্তার দুটি আলোকস্তম্ভে একটি ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি। এ যে সত্য!

আমি যেন তীব্র আঘাতে থমকে গেলাম। ক্ষীণকণ্ঠে বললাম...আমার একটি শেষ বক্তব্য আছে।

আমায় তারা ওপরে নিয়ে এলো। তাদের অনুরোধ জানালাম—আমার শেষ ইচ্ছাটি লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ দেবার। ওরা আমার হাত খুলে দিল। গিরেটা ঠিকই রইলো—যেন আবার লাগানো যায় সহজেই।

[বেয়াল্লিশ]

একজন জজ কমিশনার হয়ত বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এলেন। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম—জোড় করে, তার পায়ের তলায়—হাঁটু গেড়ে বসে।

মারাত্মক হাসির সঙ্গে তিনি আমায় জিগ্যেস করলেন, তোমার কি আর কিছু বলার নেই?

অবকাশ—ক্ষমা! দয়া করে আর কটি মিনিট সময় দিন্‌···

কে জানে, ক্ষমার আদেশ হয়তো আসতে পারে। আমারই মতো কাঁচা বয়সে মৃত্যু কী ভীষণ!

মুক্তির আদেশ এসে থাকে এমনি শেষ মুহূর্তেই। আমায় দয়া না দেখিয়ে তারা আর কাকে দেখাবে?

সেই বিকট মূর্তি জল্লাদ! জজ সাহেবের কাছে এসে বললো—ফাঁসির সময় হয়ে এলো, বলে, দায়িত্ব তাঁরই। তা' ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে, পিছলে যাবারও আশঙ্কা রয়েছে।

দয়া করুন। পাঁচ মিনিট! শুধু পাঁচটি মিনিট আমায় ক্ষমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে দিন্‌, নইলে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা কর্‌বো।

জজ আর জল্লাদ বাইরে চলে গেল! আমি একা—দু' পাশে দু'জন সান্ত্রী।

ঐ—ঐ যে উন্মত্ত জনতা চিৎকার করছে···সময় হয়েছে··· উঃ—হাঃ—!

কে জানে, আমি মুক্তি পাবো, আমি বাঁচবো কিনা। যদি আমার মুক্তির আদেশ—এ অসম্ভব,—তারা আমায় ক্ষমা করবে।

ঐ শোন, কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে! আমি যেন ফাঁসির রজ্জু চুম্বন করতে চলেছি—

ঢং—ঢং—ঢং—ঢং।